পতুলার সায়েন্স



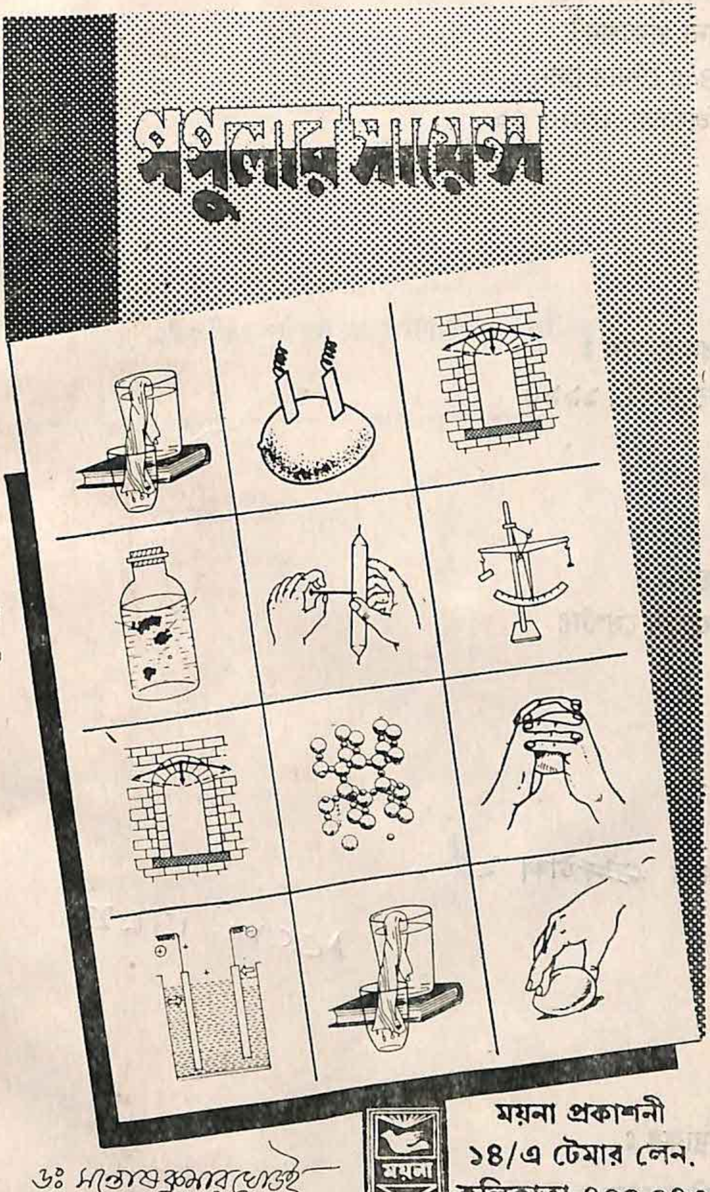
ডঃ সন্তোষকুমার ঘোড়ই

পপুলার সায়েন্স

ভল্যুম ওয়ান

POPULAR SCIENCE

Vol. One


সায়েন্স
ময়না প্রকাশনী
১৪/এ টেমার লেন.
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
ডঃ সন্তোষকুমার ঘোড়ই

প্রকাশক :
শ্যামসুন্দর সাহু
ময়না প্রকাশনী
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০ ০৯

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

প্রচ্ছদ :
ডিজাইন সেণ্টার

মূল্য : ~~ষোল~~ টাকা ২০/-

মুদ্রাকর :
রবীন্দ্র প্রেস
১২, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০ ০৬

ধীর-স্থির পাপিন আর সদাচঞ্চল পিউনকে

—বাপি

পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স
পপুলার সায়েন্স

শুরুর আগে

বিজ্ঞানকে কেবল পাঠক্রমের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখে সাধারণের সম্ভ্রম আদায় করা হচ্ছে। যেন ভাবটা এরকম ঃ ওরে বাবা! সায়েন্স? —ওটা সাধারণের জন্য নয়, কেবল মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য। আবার সায়েন্স পড়লেই স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হয়; নিজেকে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের থেকে আলাদা করার প্রবণতা গড়ে ওঠে। এসব ভুল, সম্পূর্ণ ভুল।

মানুষের জন্য বিজ্ঞান। স্বনির্ভরতার জন্য বিজ্ঞান। প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতা একান্ত অপরিহার্য। সাধারণ মানুষের ভাষা ও ভাবনা দিয়ে এখনও বিংশশতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে আমরা প্রকৃত বিজ্ঞানকে গ্রহণ বা গলাধঃকরণ করতে পারিনি। এখনও পরিভাষার প্রতিবন্ধকতাকে বাংলায় বিজ্ঞান প্রসার বা প্রচার না হওয়ার কারণ হিসেবে ধরা হয়। অথচ সাধারণ মানুষ "চেয়ার" বোঝে "কেদারা" বোঝে না; "পপুলার সায়েন্স" সহজে বোঝে "লোকায়ত বিজ্ঞান" সহজে বোঝে না। তাই নাক-উঁচু অতিবিদগ্ধ বিদ্বজ্জনের জন্য নয়, হাজারো-সবার জন্য আমার এই বিনম্র প্রয়াস—পপুলার সায়েন্স।

সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেতমজুর সবাই যেদিন তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারবে, সেদিনই সব কুসংস্কার দূরীভূত হবে, আর জীবনধারণের সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে। "পপুলার সায়েন্স" বইটি যদি প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা ও যুক্তিনির্ভর মানসিকতা সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে তাহলেই আমার চরম সার্থকতা খুঁজে পাব।

নিবেদক
সন্তোষকুমার ঘোড়ই

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯০

বিষয়সূচী

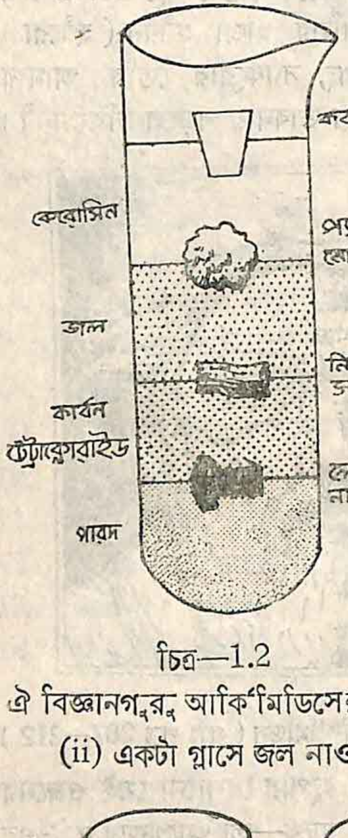
1. ভাসানোর মজা

বিজ্ঞানজগতের প্রথম গুরু আর্কিমিডিসকে (খ্রীঃ পূঃ 287-212) দিয়ে শুরু করা যাক্। সেই যে সিসিলির রাজা হীরন (হীরো) আর্কিমিডিসকে বলেছিল—'দেখতো বাপু, স্যাক্রার তৈরি আমার সোনার মুকুটটা খাঁটি সোনার কিনা।' মহা ভাবনায় পড়লেন বিজ্ঞানী। হঠাৎ কিনা জানা যায়নি, তবে জলভর্তি চৌবাচ্চায় নেমে স্নান করলে দেহ হাল্কা লাগে এবং দেহের সম-আয়তন জল উপচে পড়ে। এ ঘটনা লক্ষ্য করে আর্কিমিডিস মুকুট সমস্যার সমাধান করেন। একটা খাঁটি সোনার মুকুট কানায় কানায় জলভর্তি পাত্রে ডুবালে খানিকটা জল উপচে পড়বে, ঠিক একই ওজনের রূপার মুকুট ঐভাবে ডুবালে এর প্রায় দ্বিগুণ জল উপচে পড়ে। সোনা রূপায় মেশানো সেই ওজনের মুকুট ডুবালে যে পরিমাণ জল উপচে যাবে—তা আগেকার দুই-এর মাঝামাঝি। এই পদ্ধতি গ্রহণ করে আর্কিমিডিস হীরনের মুকুটটি খাঁটি সোনার কিনা—তা ধরতে পেরেছিলেন। এ থেকেই জন্ম হয়েছে 'আর্কিমিডিসের নীতি'। এ থেকেই বোঝা যায় বস্তুর ডোবা-ভাসার রহস্য। রহস্যটা এই—যদি বস্তুর ওজন তার সমান আয়তনের তরলের চেয়ে বেশী হয় তাহলে বস্তুটা ডুববে, আর যদি কম হয় তাহলে ভাসবে। আর যদি সমান হয়—তাহলে ঠিক ডুবে ভাসবে। নিচের পরীক্ষাগুলো করেই দেখনা !



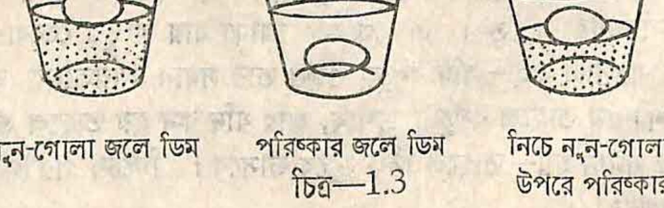
চিত্র—1.1 আর্কিমিডিস (খ্রীঃ পূঃ 287—212)

(i) কেমন করে বিভিন্ন জিনিসকে তরলে বিভিন্ন অবস্থানে ভাসিয়ে রাখা যায় তার একটি পরীক্ষা কর (চিত্র-1.2) । লম্বা কাচের একটা জার, কিছুটা পারদ, কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড, জল আর কেরোসিন নাও । এবার চারটি জিনিস—লোহার নাট বা বল্টু ; নিম কাঠের সার অংশের (কাল্‌চে গাছের অংশ) কিছুটা টুক্‌রো, শক্ত প্যারাফিন মোম এক দলা এবং একটা কর্ক জোগাড় কর । জারে প্রথমে পারদ তারপর পর্যায়ক্রমে কিছুটা কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড, কিছুটা জল, কিছুটা কেরোসিন তেল ঢাল। এবার একসঙ্গে বা পরপর ঐ চারটি শক্ত জিনিস ছেড়ে দাও। দেখ, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা কেমন ভাসছে! কেন ? তার কারণ ঐ বিজ্ঞানগুরু আর্কিমিডিসের ভাসানোর নীতির মধ্যেই নিহিত।



চিত্র—1.2

(ii) একটা গ্লাসে জল নাও। এবার একটা ভাল ডিম তাতে ছেড়ে দাও।



নুন-গোলা জলে ডিম   পরিষ্কার জলে ডিম   নিচে নুন-গোলা জল উপরে পরিষ্কার জল

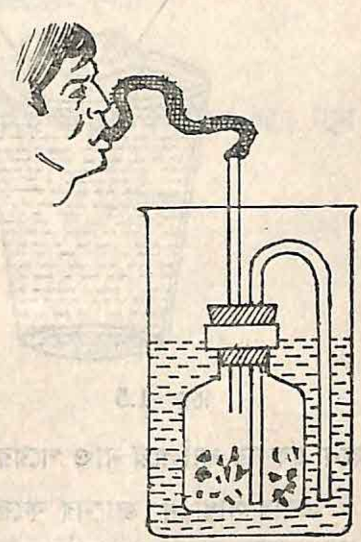
চিত্র—1.3

এরপর জলে নুন গুলতে থাক। দেখ ডিমটা ভেসে উঠে কিনা (চিত্র 1.3)।

এবার নিশ্চয়ই বলতে পারবে কেন নদী থেকে সমুদ্রে গেলে জাহাজ অনেকটা বেশি ভেসে উঠে ?

(iii) **ইচ্ছেমত ডোবাই-ভাসাই-এর পরীক্ষা** (চিত্র-1.4) :

একটা ভাল সাইজের একটু বড় মুখওয়ালা বোতল জোগাড় কর। বোতলের তলায় কয়েক খণ্ড লোহার টুক্‌রো বা পাথরের টুক্‌রো ফেল। দেখ যেন বড় কোন জলের পাত্রে বোতলটা স্থির অবস্থায় ভাসে। এবার একটা U আকারের কাচের নল জোগাড় কর। ঐ কাচের নলটার একদিক একটা রাবার কর্ক-এর ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে বোতলের তলা পর্যন্ত চালান কর। কর্কটার অন্য ছিদ্র দিয়ে একটা সোজা কাচের নল লাগাও ; ঐ নলের মুখে একটা রাবার নল ভালভাবে লাগিয়ে তা বাইরে নিয়ে এসো। এবার বোতলটা ডোবাতে চাইলে রবার নল মুখে লাগিয়ে বায়ু টান। ফলে ওদিকে উল্টানো U-নল দিয়ে জল ঢুকবে—ধীরে ধীরে বোতলটা ডুববে। বোতলটা ওঠাতে চাইলে—ফুঁ দাও অর্থাৎ রবার নলের ভিতর দিয়ে বাতাস ঢোকাও। দেখবে জল বেরিয়ে যাচ্ছে—বোতলটা ধীরে ধীরে উঠছে। কি ? কেমন মজা না ? সত্যিকথা বলতে কি তোমার এই পরীক্ষাটাই ডুবো-জাহাজের ডোবা-ভাসার নীতি নির্দেশ করে।



চিত্র —1.4

(iv) খাওয়ার টেবিলে বসে সুযোগ পেলে এ পরীক্ষাটা (চিত্র 1.5) করে দেখাতে পারো। জলভরা গ্লাসে একটা বরফের টুক্‌রো ফেল। দেখবে বরফটা ভাসছে। কেন বলত ? কারণ 0°C উষ্ণতায় 11 মিলিলিটার জল জমে 0°C উষ্ণতায় বরফে পরিণত হলে তা 12 মিলিলিটার আয়তন লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে ভাসনের নিয়ম মেনে বরফের 12 ভাগ আয়তনের এক ভাগ জলের বাইরে আর 11 ভাগ জলের মধ্যে থাকে। এবার একটা সুতো বা সরু তার জোগাড় কর। বরফকে হাত দিয়ে না

ছুঁয়ে ঐ তার দিয়ে জল থেকে বাইরে আনতে পারবে কি ? সবাই একটু অবাক দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাবে ঠিকই। কিন্তু এসময় তুমি খাওয়ার টেবিলে রাখা নুন দানিটা থেকে কিছুটা নুন ভেসে থাকা বরফের উপর ফেলে রাখা তারের উপর ছড়িয়ে দাও। কথার কথায় দু-এক মিনিট অতিক্রান্ত হলে পর এবার দুদিকে তারটা ধরে উপরে উঠাও। দেখবে সব বরফটা উঠে এল। সবাই যখন প্রায় হাততালি দিতে ব্যস্ত, এসময় তোমার পদার্থ বিজ্ঞানে পড়া হিমমিশ্রের ব্যাপারটা মনে মনে একবার ঝালিয়ে নাও পরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য।


চিত্র—1.5

এবার সাধারণ জ্ঞানের কয়েকটা প্রশ্ন দিলাম, পাশে উত্তর রইলো—কারণগুলো ত ক্লাসের পাঠ্য বইতে আছে।

প্রঃ—একটা গ্লাস কানায় কানায় জলপূর্ণ এবং ঐ অবস্থায় জলের মধ্যে এক টুক্‌রো বরফ ভাসছে। বরফ টুক্‌রো গলে জল হলে এবং জলের উষ্ণতা 0°C থাকলে জলের তল কোথায় থাকবে ? গ্লাসের জলের উষ্ণতা 4°C করে বা উত্তপ্ত জল নিয়ে বরফ ভাসালেই বা জলের তল কোথায় থাকবে যখন সমস্ত বরফ গলে যাবে ?

[উঃ—জলতলের কোন পরিবর্তন হবে না ; জল উপচে পড়বে ; জলের তল খানিকটা নেমে যাবে।]

প্রঃ—ছোট একটা লেকে লোহার টুক্‌রো বোঝাই একটা নৌকা ভাসছে। লোহার টুক্‌রোগুলো নৌকা থেকে জলে ফেলে দিলে, লেকের জলতলের কি পরিবর্তন ঘটবে ?

[উঃ—জলতল নেমে যাবে।]

প্রঃ—সাঁতার না জানলেও জর্ডন ও ইস্রাইলের মধ্যে অবস্থিত প্যালেস্টাইনের 'ডেড-সি'-র গভীর জলে ডুবে মরার ভয় নেই (চিত্র 1.6) কেন?



চিত্র—1.6

[ইঙ্গিত ঃ ডেড-সির জলে প্রচুর নুন রয়েছে। প্রতি লিটারে গড়ে নুন আছে 250 থেকে 280 গ্রাম।]

2. দে দোল্ দোল্

গল্প নয়, একটা ঘটনা বলি। ষোড়শ শতাব্দীর কথা। গ্যালিলেও গ্যালিলি একদিন এক গীর্জায় গিয়ে দেখলেন ঃ

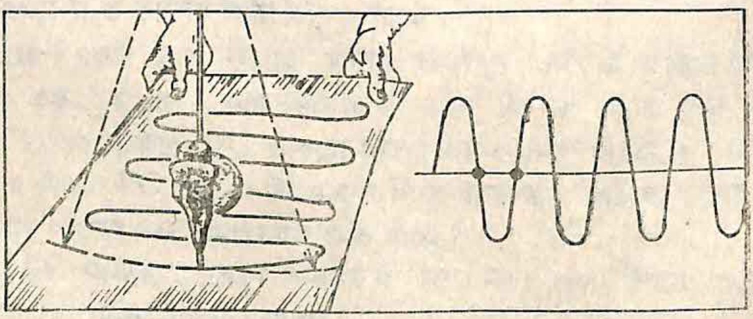
—আরে ঝাড়লণ্ঠনটা এদিক-ওদিক বেশ দুলছে ত! কিন্তু ওটা জোরে দোলার সময় যে সময় অন্তর ফিরে ফিরে আসছে, আস্তে দুললেও যেন মনে হচ্ছে সেই একই সময় লাগছে। ভুল ভাবছি না ত?



গ্যালিলেও (খ্রীঃ 1564—1642)
চিত্র—2.1

—কি করা যায়? কিভাবে আমার ভাবনাটা যে ঠিক তার হদিশ পাওয়া যায়? এটা ভাবতে ভাবতে নিজের এক হাতের নাড়ীটা অন্যহাতে ধরলেন আর দোল খাওয়া ঝাড়লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে নাড়ীর ধক্ ধক্ শব্দ শুনলেন।

—এক, দুই, তিন ··· ঠিক্, একেবারেই ঠিক। যা ভেবেছি তাই।



চিত্র—2.2

বেশী বা কম যেকোন রকম দুলুক না কেন, প্রতিটি দোলার জন্য একই সংখ্যার ধক্ধকানি পাচ্ছি।

এভাবেই জন্মলাভ করেছিলো প্রথম পেণ্ডুলাম বা দোলকের। এরপর থেকে ডাক্তাররা পেণ্ডুলাম দুলিয়ে নাড়ীর ধক্‌ধক্ সংখ্যা মাপতে শুরু করল। সৃষ্টি হল দোলক ঘড়ি।

সুতোর তলায় এক টুক্‌রো পাথর ঝুলিয়ে দিলেই সরল দোলক তৈরি হয়ে যায়। দোলকের এই দোলগতিটাকে কি ধরে রাখা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। আর তার জন্য এই পরীক্ষাটা (চিত্র 2.2) সহজেই করা যায়।

একটি ছোট সুচালো পেন্সিলকে ভাঙা একটা কাঁটা-কম্পাসের কেবল মাথাটার সঙ্গে আটকাও। এক টুক্‌রো লোহা বা শক্ত নুড়ি হলেও চলবে। এবার একটা সুতো (না-পাক খাওয়া) দিয়ে ওটাকে ঝোলাও, যাতে পেন্সিলের ডোগাটা ঠিক টেবিলের উপর রাখা কাগজটাকে স্পর্শ করে। আস্তে করে দোলাও। দেখবে পেণ্ডুলাম দুলছে, আর পেন্সিলের

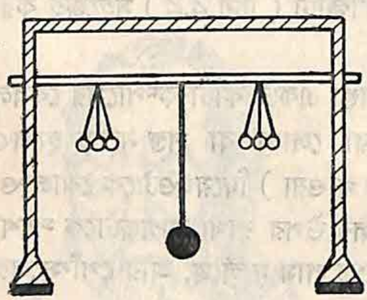


চিত্র—2.3

দাগ পড়ছে কাগজে। ধীরে ধীরে এবার যদি কাগজটাকে সমান বেগে টানো—তাহলে বেশ সুন্দর একটা লেখচিত্র কাগজের উপর ফুটে উঠবে। এটাই দোলগতির বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে রেখো হৃদ্‌স্পন্দন কিংবা যে কোন ধরনের কম্পন ধরে রাখার সব পদ্ধতির মূলনীতি এটাই। একটা বিড়ালের হৃদ্‌স্পন্দন কেমন ধরে রাখা গেছে, তা 2.3নং ছবিতে দেখ।

দোলনা ত দোলেই। ঠিকমত নির্দিষ্ট সময় অন্তর না দুলিয়ে এলোমেলো হাত চালিয়ে দুলিয়ে দেখতো কি ঘটে?—থেমে যাবে। একটা বেশ ভারী জিনিস ঝোলানো আছে। তোমাকে বলা হল ওটাকে বেশ জোরে দোলাও। হঠাৎ চেষ্টা করলে পারবে না। কিন্তু আস্তে আস্তে নিয়মিতভাবে একটু একটু নাড়াও। দেখবে একসময় সত্যি খুব জোরে জোরে দুলছে—অথচ তেমন জোর দিতে হচ্ছে না।

একই নীতি কিন্তু ভিন্ন ধরনের একটা পরীক্ষা কর (চিত্র 2.4)। তিনটে পুতুল। দুটো একই ধরনের ছোট, অন্যটি অপেক্ষাকৃত ভারী ও বড়। একটা তার থেকে তিনটিকে ঝোলাও—ছোট দুটো একই স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং তৃতীয়টি বড় দৈর্ঘ্যের সুতো দিয়ে। এবার এদিক ওদিক





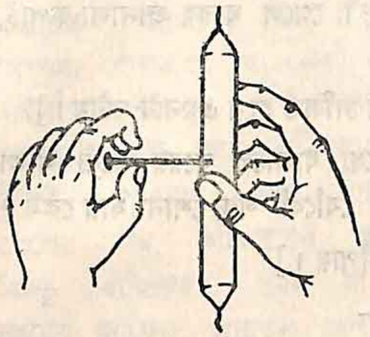
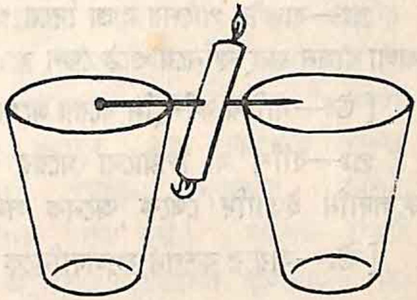
চিত্র—2.4

কোন একটা ছোট পুতুলকে দুলিয়ে দাও। দেখ—কেমন চুপচাপ দূরে থাকা অন্য ছোট পুতুলটা তাতে সাড়া দেয়। একটা থামবে—অন্যটা নড়বে; অন্যটা থামবে প্রথমটা নড়বে। মাঝামঝি কোনসময়ে তারা উভয়েই জোরে দোল খাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চলবে। এরা যেন পরস্পরের সমব্যথী—তাই এর নাম 'সমব্যথী কম্পন'। লম্বা দৈর্ঘ্যের বড় পুতুলটা কেমন নির্বিকার—কোন কিছুতেই যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার ঝুলন বিন্দু দিয়ে একের কম্পন অন্যটিতে সঞ্চালিত হওয়া সত্ত্বেও নির্বিকার বড়টিতে নড়ন-চড়নের লক্ষণ খুব একটা প্রকাশ পায় না। মজার এই পরীক্ষাটা করে মজা পাও, অন্যকে মজাও।

শেষ একটা পরীক্ষার কথা বলি। আগুন নিয়ে খেলা—আগুনের দোলন। অন্ধকারে করলে ভালই লাগবে। একটা মোমবাতি নিয়ে তার দুদিকের মুখ পেন্সিল কাটার মত কেটে দাও (চিত্র 2.5)।

এবার বাতিটার ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা আলপিন ফুটিয়ে দাও (স্কেল ব্যবহার কর)। তারপর ছবির মত পাশাপাশি দুটো গ্লাস রেখে পিনের মাথা একটা গ্লাসে আর সুচালো দিকটা অন্য গ্লাসে রাখো

(চিত্র 2.6)। মোমবাতির দুদিকের পলতেতে এবার আগুন ধরাও। দেখবে মোমবাতিটা আপনমনে একবার এদিক একবার ওদিক স্বত-স্ফূর্ত ভাবে দুলছে—কখনওবা একপাক ঘুরে আসছে।

চিত্র—2.5　　চিত্র—2.6

সব জিনিসের বা ঘটনার কার্যকারণ অনেক সময় গুছিয়ে মুখে প্রকাশ করা যায় না—কিন্তু উপলব্ধি করা যায় কেন ঘটছে। এটাই বা কম কি! প্রসঙ্গক্রমে Emily Dickinson-এর কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে ছেদ টানছি।

I never saw a moor,
I never saw the sea ;
yet I know how the heather looks,
And what a wave must be,

অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

আমি তেপান্তরের মাঠ দেখিনি,
দেখিনি কখনও সমুদ্র বিশাল ;
তবু জানি আমি কেমন মাঠের গুল্ম,
বুঝি কেমনে ওঠে তরঙ্গ উত্তাল।

কয়েকটি প্রশ্ন ঃ

প্রঃ—সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর একটি সেতুর উপর ভারী ভারী যানবাহন চলাচল করত। একদিন একদল সৈন্য মার্চ করতে করতে সেতুটা পেরুচ্ছিল। হঠাৎ সেতুটা খুব জোরে দুলতে শুরু করল ; আর মুহূর্তের মধ্যে তা ভেঙে পড়ল। কেন এমনটা ঘটল ?

[উঃ—সৈন্যদের নিয়মিত পা ফেলার সময় আর সেতুর দোলনের সময় সমান হয়ে যাওয়ার ফলে, সেতুটি প্রচণ্ড বিস্তারে দোলার জন্যই এই পরিণতি। একে বিজ্ঞানের ভাষায় 'অনুনাদ' বলে।]

প্রঃ—বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ী গেলে ঘরের জানালা-কপাট, থালা বাসন ঝন্-ঝনিয়ে ওঠে কেন ?

[উঃ—মাটির কাঁপুনি ঘরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে এমনটা ঘটায়।]

প্রঃ—বাঁশি বা পিয়ানো ঘরের মধ্যে বাজালে ঘরের মধ্যে থাকা ফুলদানি ইত্যাদি থেকে অনেক সময় বোঁবোঁ শব্দ শোনা যায় কেন ?

[উঃ—বায়ুর কম্পন ফুলদানিকে কাঁপায়।]

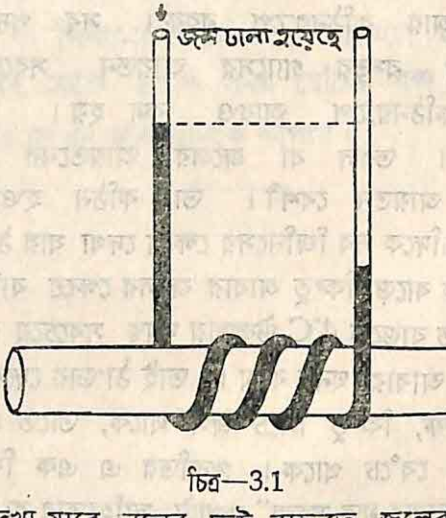
৩. জল বড়ই জটিল

জলীয় বাষ্প, জল, বরফ—জলের এই তিন অবস্থার সঙ্গেই আমরা পরিচিত। আকাশের মেঘ বা রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি থেকে জলীয়-বাষ্পের, বাথরুমে বা নদী-নালায় জলের আর রেফ্রিজারেটর বা আইসক্রিমে বরফের রূপ আমরা দেখি। গ্যাসরূপে জলীয় বাষ্প, তরলরূপে জল আর কঠিনরূপে বরফ। সব পদার্থের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর গ্যাসের আয়তন সবচেয়ে বেশী, তরলের কম, কঠিনরূপে আরও কম হয়। জলের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম। তরল বা জলের আয়তনের তুলনায় সম-ওজনের বরফের আয়তন বেশী। তাই কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তা জলে ভাসে। অন্যদিকে সব জিনিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠাণ্ডা করলে বা উষ্ণতা কমালে ঘনত্ব বাড়ে, কিন্তু আবার জলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, উষ্ণতা কমালে ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে 4°C উষ্ণতায় ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয়, তার নিচে গেলে কিন্তু আবার ঘনত্ব কমে। তাই ঠাণ্ডার দেশে মেরুপ্রদেশে লেকের উপরে বরফ, কিন্তু নিচে জল থাকে, তাতে মাছ বা জলচর জন্তুরা নির্বিধায় বেঁচে থাকে। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র খেয়াল। তাই বলছিলাম, "জলের মত সহজ" কথাটা সাহিত্যের বা কথোপকথনের খাতিরে ব্যবহৃত হলে কি হবে, জলের মত জটিল পদার্থ বিজ্ঞানে আর নেই বলা চলে। যাই হোক্ এবার এই জল নিয়ে কিছু পরীক্ষা করা যাক। সেখানেও দেখব জলের জটিলতা।

[এক] জল আপন উষ্ণতা খুঁজে নেয়। ছাদ বা ঘরের জল আটকে না থেকে ঢালু নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায়, উঁচু রাস্তার জল গড়িয়ে নিচের মাঠে পড়ে, পাহাড়ী ঝরনার জল সমতলভূমির দিকে ধেয়ে আসে—এসব ঘটনার কারণ হল, জল সব সময় একই তলে বা লেভেলে থাকতে চায়। জলের এই ধর্মকে সমোচ্চশীলতা বা সমতল প্রবণতা বলে। জলের এই ধর্মের ভিত্তিতেই প্রস্রবণ সৃষ্টি হয়, আর্টেজীয় কূপ তৈরি হয় ইত্যাদি। স্কুলের বইতে সাধারণ পরীক্ষা হিসাবে দেওয়া হয় যে একটা U-আকৃতির নল নিয়ে তাতে জল ঢাল, দেখবে দুটি বাহুতে একই উচ্চতার জল উঠেছে ; বিভিন্ন আকারের নল নিয়েও দেখা যায় প্রতিক্ষেত্রে জলের

তল অনুভূমিক একই উচ্চতায় রয়েছে। অর্থাৎ, পরীক্ষা প্রমাণ করে জলের সমোচ্চশীলতা ধর্ম রয়েছে। এবার নিচের পরীক্ষাটি করা যাক।

প্রায় ছ'মিটার লম্বা এবং আড়াই সেণ্টিমিটার ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক নলকে একটা চোঙের উপর পাক দিয়ে জড়াও। এবার নলটির একমুখে ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে রঙিন জল ঢালতে থাকলে



চিত্র—3.1

কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে নলের দুই বাহুতে জলের উচ্চতায় ভিন্নতা রয়েছে (চিত্র 3.1)। তাহলে কি জলের সমোচ্চশীলতা ধর্ম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? হঠাৎ ধাঁধায় ফেলে দেয়। জল নিয়ে পরীক্ষাটির ব্যাখ্যা জটিল মনে হয়।

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পাকগুলির মধ্যে কিছুটা আবদ্ধ বায়ু রয়েছে। আবদ্ধ বায়ুর ওজন তুলনায় নগণ্য, কিন্তু বায়ুগুলি বিচ্ছিন্ন জলস্তম্ভের মধ্যে চাপ পরিবহণে সহায়তা করছে। ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকার কারণেই পরীক্ষাটি এরূপ ফলাফল দিচ্ছে। এরূপ একটি ঘটনা হল, বাড়ীতে জলের পাইপের এক প্রান্তে যথেষ্ট বদ্ধতা রাখলে অন্য প্রান্তে জল ঢাললেও নল দিয়ে জল বেরুবে না। মনে হবে নলের মুখ জঞ্জালে যেন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

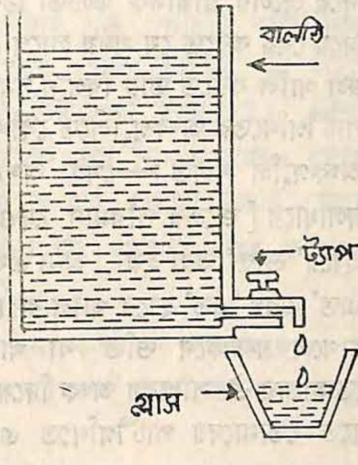
[দুই] একটা বড় বালতিতে ত্রিশ গ্লাস জল ধরে। বালতির তলায় পাশের দিকে একটি ট্যাপ লাগানো। ট্যাপ খুলে এক গ্লাস জল ভর্তি

করতে আধমিনিট বা ত্রিশ সেকেণ্ড লাগে। তাহলে বালতির পুরোটা খালি করতে কত সময় লাগবে ? (চিত্র 3.2)

দেখে মনে হচ্ছে এটা আবার একটা প্রশ্ন হল ! আধমিনিটে এক গ্লাস ভর্তি হলে, ত্রিশ গ্লাস জল খালি করতে পনেরো মিনিট লাগবে।

—এবার যদি বলি পরীক্ষা করেই দেখ না ? দেখবে, তোমার উত্তর মিলছে না।

কারণ, পুরো জল ভর্তি থাকা অবস্থায় ট্যাপ দিয়ে যে হারে জল বেরুবে, আধাভর্তি অবস্থায় সে হার কমে যাবে, আরও কমলে হার আরও কমে যাবে। তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক গ্লাস জল ভর্তি হতে একই সময় লাগছে—এই ধারণাটাই ঠিক নয়।



চিত্র—3.2

উপর-মুখ খোলা পাত্রের তলার ট্যাপ দিয়ে খোলা জায়গায় যে হারে জল পড়বে সেই নির্গমনের হারটি পাত্রে থাকা জলের উচ্চতার উপর নির্ভর করবে। বাড়ীতে খাওয়ার জলের ফিল্টার থাকলে সহজেই বুঝতে পারবে।

[যারা অঙ্ক বোঝ, তাদের জন্য বলছি—গ্যালিলেও-র ছাত্র টরিসেলী প্রথম দেখিয়েছিলেন, সাইডে লাগানো ঐ রকম ট্যাপ দিয়ে জল বেরোনোর বেগ $(v) = \sqrt{2gh}$, $g =$ অভিকর্ষজ ত্বরণ ; $h =$ ট্যাপের লাইন থেকে উপরের দিকে তরল তল পর্যন্ত উচ্চতা। লক্ষণীয়—নির্গমন বেগ তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না।]

দেখা যায়, 20 গ্লাস জল ট্যাপ দিয়ে বের করে নিলে, যদি বালতিতে জলের তল পূর্ণপাত্রের সিকি উচ্চতায় নেমে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে একুশতম গ্লাসটির জল ভর্তি করতে যে সময় লাগবে, তা প্রথম গ্লাস ভর্তি করতে যে সময় লেগেছিল তার দ্বিগুণ। পরবর্তী সময়ে যদি জলের উচ্চতা আরও কমে, তাহলে

আরও বেশী সময় লাগবে পরবর্তী শেষের দিকের গ্লাসগুলি ভর্তি করতে। ক্যালকুলাস (অংক) ব্যবহার করে দেখানো যায়, যদি সবসময় জলের উচ্চতা ঠিক থাকত অর্থাৎ বালতিতে বাইরের থেকে জল সাপ্লাই দিয়ে জলের প্রাথমিক উচ্চতা ঠিক রাখা হত তাহলে ত্রিশ গ্লাস জল ট্যাপ দিয়ে বের করতে যে সময় লাগে বাইরের সাপ্লাই না থাকলে ঐ পরিমাণ জল খালি করতে তার দ্বিগুণ সময় লাগবে। স্বাভাবিক ভাবেই তোমাদের পাটীগণিতের অংকগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবতা নেই। কোন্ অংকগুলি বলত ?—সেই অংকগুলি যাতে আছে—'কোন ট্যাংকে বা জলাধারে [জলের পরিমাণ দেওয়া থাকে] একটি নল দিয়ে ঘণ্টায় এত 'হারে' ভর্তি করা হয় ; অন্য একটি বা দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে ঘণ্টায় 'এত' এবং 'এত' হারে খালি করা যায়। তাহলে একসঙ্গে সব নল চালু রাখলে কতক্ষণে ভর্তি বা খালি হবে ?' এই সব অংক প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ঐ সাধারণ অংক দিয়ে সমাধান করা যায় না। তাই আমার মতে তোমাদের পাটীগণিতে এগুলি না থাকা ভাল—উপরের ক্লাসে যেখানে ক্যালকুলাস পড়ানো হয় সেখানে থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাই হোক্, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ জলের যতটা জটিলতা রয়েছে অন্য কোন বিষয় এত জটিল কিনা সন্দেহ। এখন প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রশ্ন দিই।

প্রঃ—ঐ বালতিতে যদি একই উচ্চতার জলের পরিবর্তে পারদ রাখতাম, তাহলে ট্যাপ খুলে বালতিটি খালি করতে কি কম সময় লাগত ?

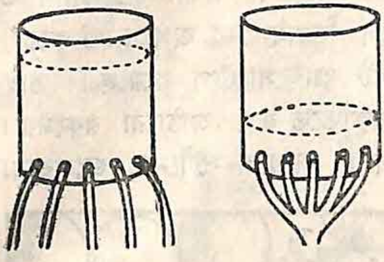
[উঃ—না, কারণ ট্যাপ দিয়ে বেরোনোর হার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না।]

প্রঃ—কল্পনায় যদি ঐ পরীক্ষাটি চাঁদে করতাম তাহলে কি ঐ একই সময়ে বালতি খালি হত ?

[উঃ—না, প্রায় আড়াইগুণ বেশী সময় লাগত ; চাঁদের অভিকর্ষ কম, তাই বেরোনোর হার কম।]

[তিন] জলের জটিলতার আর একটি নিদর্শন দিই। একটা টিনের কৌটো জোগাড় কর। কৌটোর তলার ঠিক উপরে প্রায় পাঁচ মিলিমিটার অন্তর অন্তর সূঁচালো পেরেক দিয়ে পাঁচটি ফুটো কর। এবার কৌটোটা যদি জল দিয়ে ভর্তি কর, দেখবে পাঁচটি ধারায় ঐ ফুটোগুলি

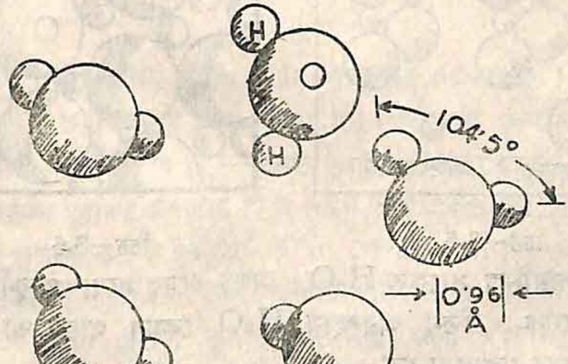
থেকে জল বেরুচ্ছে। এবার বুড়ো আঙুল ও তর্জনী ব্যবহার করে ঐ পাঁচটি ধারার সঙ্গম ঘটিয়ে, একটি ধারায় রূপান্তরিত করে দাও। আবার যদি পাঁচটি ধারা ফিরে পেতে চাও তাহলে ঐ পাঁচটি ফুটোর উপর হাত ঘষ। দেখবে পৃথক ধারা নির্গত হচ্ছে। জলের ধারার এই জোড়া-ভাঙার খেলার জন্য যে ধর্মটি কাজ করছে—



চিত্র—3.3

তার নাম জলের 'পৃষ্ঠটান' (চিত্র 3.3)।

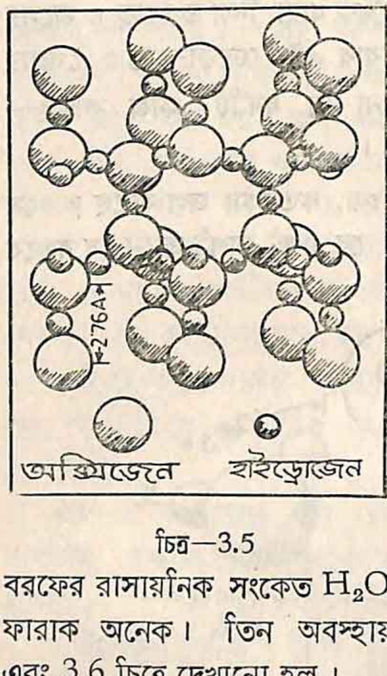
[চার] কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কতরকম জল আছে ? সে হয়ত বলবে—জল ? জল ত এক রকমের। যে একটু বেশী জানে সে বলবে



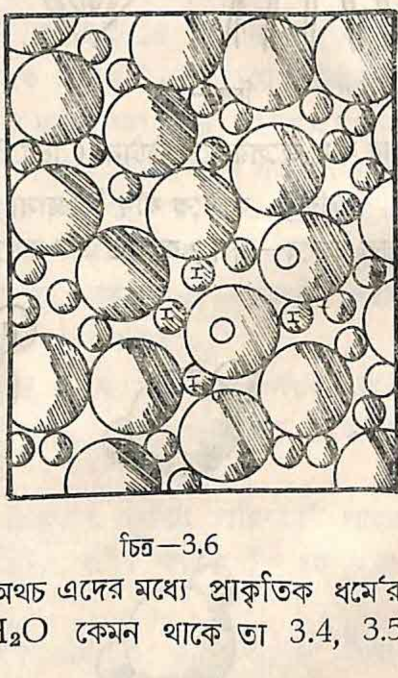
চিত্র—3.4

দু'রকমের—সাধারণ জল আর ভারী জল। যে আরো একটু অভিজ্ঞ সে বলবে—তিন ধরনের জল আছে—প্রোটিয়াম জল (H_2O), ডয়টেরিয়াম জল (D_2O) আর ট্রিটিয়াম জল (T_2O)। কিন্তু তাই কি ? প্রকৃতিতে কিন্তু সাধারণ ভাবে আঠারো রকমের জল পাওয়া যেতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যেতে পারে আরও কয়েক ধরনের জল। জলের অণুতে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু থাকার ফলে মিশ্র

হাইড্রোজেন আইসোটোপীয় জলের অস্তিত্ব সম্ভব। অর্থাৎ একটি প্রোটিয়াম ও একটি ডয়টেরিয়াম (HDO) বা একটি প্রোটিয়াম ও একটি ট্রিটিয়াম (HTO) ইত্যাদি মিলে ভিন্নধরনের জল সৃষ্টি করে। অন্য দিকে আবার অক্সিজেনেরও তিনটি আইসোটোপ রয়েছে। তাই সবকিছু মিলে মিশে হিসেব করলে প্রকৃতিতে জল আঠারো রকমের। জলের জটিলতা এখানেও প্রণিধানযোগ্য। আবার স্টীমের, জলের বা



চিত্র—3.5



চিত্র—3.6

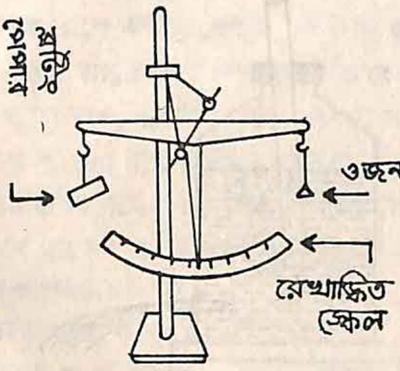
বরফের রাসায়নিক সংকেত H_2O ; অথচ এদের মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্মের ফারাক অনেক। তিন অবস্থায় H_2O কেমন থাকে তা 3.4, 3.5 এবং 3.6 চিত্রে দেখানো হল।

[পাঁচ] বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। মূলত এই জলীয় বাষ্পই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে; এবং পৃথিবীর শ্যামলিমা রক্ষার দায়িত্ব নেয়। তাই বায়ুতে এর মাত্রা জানা জরুরী প্রয়োজন।

বাতাসে জলীয় বাষ্পের মাত্রা বেড়েছে না কমেছে জানার জন্য যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম 'হাইগ্রোমিটার'। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জেনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, শারীরিক অস্বস্তি ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। সাধারণ ব্লটিং পেপার দিয়ে হাইগ্রোমিটার

তৈরি করার একটি পরীক্ষা 3.7 চিত্রে দেওয়া হল। ছবিটি লক্ষ্য করে নিজে বানাও।

ব্লটিং পেপার বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে। এরূপ শোষণে পেপারটির ওজন বাড়ে। আবার শুকনো আবহাওয়ায় শোষিত



চিত্র—3.7

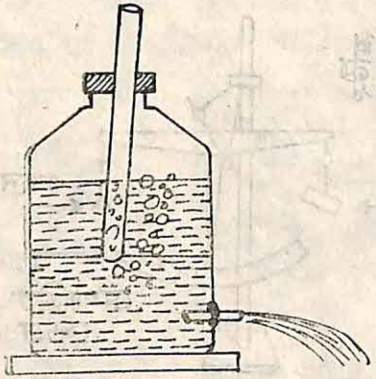
জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়, ফলে ব্লটিং পেপারের ওজন কমে। কাজেই বাতাসে আর্দ্রতার কমা-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লটিং পেপারের ওজনের সামান্য কমা-বাড়া ঘটে। এই নীতি গ্রহণ করেই পরীক্ষাটি করা হয়েছে।

একটা পাতলা প্লাস্টিকের সরু পাত নিয়ে তার একপ্রান্তে প্রয়োজনীয় ওজন ও অন্য প্রান্তে কয়েক টুক্‌রো ব্লটিং পেপার লাগিয়ে মাঝে পিন ঢুকিয়ে এমনভাবে ঝোলাও যাতে পাতটি সাম্যাবস্থায় অনুভূমিক ভাবে থাকে। অর্থাৎ এটি একটি তুলাদণ্ডের মত কাজ করে। পাতটির মাঝখান থেকে একটি সূচক আটকাও, যা অংশাঙ্কিত স্কেলের উপর চলাচল করে। জলীয় বাষ্প বাড়লে বাঁদিকের ওজন বাড়ে, সূচক ডানদিকে যায়, কমলে সূচক বাঁদিকে যাবে।

যন্ত্রটি খোলা রাখলে সূচকটি বাতাসে দুলবে তাই বাতাস আড়াল করার জন্য একটা ফুটো করা কাচের বাক্সে রাখলে ভাল হবে। কেন ফুটো রাখতে বলা হচ্ছে? নিজেরা ভেবে দেখ।

প্রঃ—এমন কোন পাত্র কি তৈরি করা যাবে, যার মধ্যে জলতল নেমে এলেও সবসময়ই জল পাশের ট্যাপ বা ছিদ্র দিয়ে একই বেগে পড়তে থাকবে?

[উঃ—হ্যাঁ, তৈরি করা সম্ভব। সর্-মুখওয়ালা একটা বোতলের মুখে লাগানো কর্কের ভিতর দিয়ে একটা কাঁচের ফাঁপা নল ঢুকিয়ে দিয়ে এধরনের পাত্র তৈরি করা যায় (চিত্র 3.8)। যখন নলের নিচের ছিদ্র খুলে দেওয়া হয়, তখন সমবেগে ঐ ছিদ্র দিয়ে জল বের্তে থাকে



চিত্র—3.8

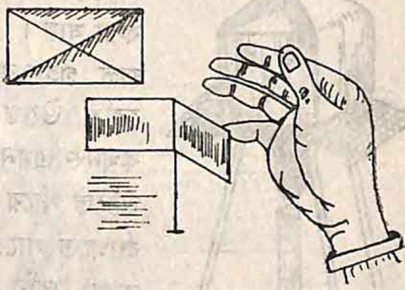
ততক্ষণ, যতক্ষণ না জলতল ভেতরে ডোবানো কাঁচের নলের নিচে আসছে। কাঁচনলটি প্রায় ছিদ্রের তল পর্যন্ত নামিয়ে এনে, পাত্রের সব জলই সমবেগে বের করা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে নির্গত ধারাটির বেগ খুবই কম হবে।]

4. কাগজ নিয়ে কারিকুরি

কাগজের প্রথম আবিষ্কার নাকি চীন দেশে হয়েছিল। এই কাগজের আবিষ্কার আধুনিক সভ্যতাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। কাগজ ছাড়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি টিকে আছে ভাবা যায় না। যাই হোক্, এই কাগজ নিয়েই আমরা পরীক্ষার ব্যবস্থা করি। যদিও পরীক্ষাগুলি লিপিবদ্ধ হচ্ছে আবার কাগজেই।

[এক] **হাতের তাপে কাগজ ঘোরে** 4.1 নং ছবিটি দেখ।

খুব পাতলা একটা আয়তাকার কাগজের টুক্‌রো কোনাকুনি বরাবর দুবার ভাঁজ করে খুলে দাও, এবার সেটিকে একটা সূঁচের মাথার উপর বসাও। কাগজটাকে সূঁচের মাথার উপর এমনভাবে রাখো যাতে কাগজের ভরকেন্দ্রটা ঠিক ওর উপর বসে। এর ফলে কাগজটা সাম্য-অবস্থায় সূঁচের ডগায় ভাসমান ভাবে থাকে। এবার হাতটাকে সাবধানে কাগজটার উপরে ধর। কাগজটা ঘুরতে শুরু করবেঃ ধীরে ধীরে পাক খেতে শুরু করবে এবং সময়ের সঙ্গে গতিও বাড়বে। হাত সরিয়ে নিলে ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার কাছে হাত আনলে ঘোরা শুরু হবে। দেখতে পাবে কাগজের টুক্‌রোটা কব্জি থেকে আঙুলের ডোগার দিকে—সব সময় ঘুরছে উল্টো দিকে নয়। কারণ? কারণটা বন্ধনীর মধ্যে দিচ্ছি। তা না হলে ঘটনাটিকে অতিপ্রাকৃত বলে ভেবে বসতে পার। (হাতটা যখন কাগজের উপরে থাকে, তখন পারিপার্শ্বিক বাতাস হাতের সান্নিধ্যে এসে গরম হয়ে উপরে উঠে গিয়ে কাগজের গায়ে চাপ দিয়ে তাকে ঘোরাতে থাকে। ঈষৎ ভাঁজ করা অবস্থার জন্যই কাগজটা ঘোরে। আর কব্জি থেকে আঙুলের ডোগার দিকে ঘোরার কারণ হল, হাতের তালু অপেক্ষা আঙুলের ডোগা অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা। তাই আঙুলের ডোগার তুলনায় তালুর থেকে বেশি জোরালো ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোত বয়। গায়ে জ্বর থাকলে কিন্তু এ পরীক্ষায় কাগজটি বেশ জোরে ঘুরবে। তার কারণও অপেক্ষাকৃত বেশি উষ্ণতা ও আনুষঙ্গিক পরিচলন-স্রোত বৃদ্ধি।)

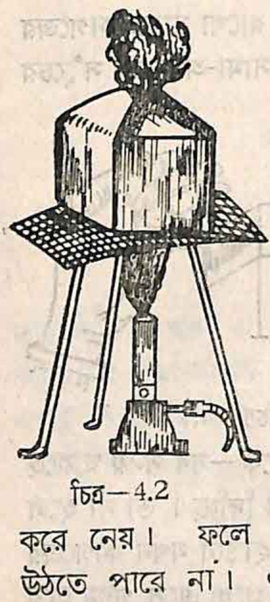


চিত্র—4.1

[দুই] আগুনে কাগজ পোড়ে নাঃ যুক্তি-তর্ক নয়, পরীক্ষা করেই দেখাচ্ছি। (i) একটা তামার বা লোহার রড নাও। তারপর সরু একফালি

কাগজকে টান-টান করে ঐ রডের গায়ে প্যাঁচের মত জড়িয়ে দাও। এটাকে এবার আগুনের উপর ধরো। যতক্ষণ ধাতব রডটি তেতে লাল না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাগজ পুড়বে না। কাগজ না পোড়ার জন্য ধাতুর সুপরিবাহিতা ধর্মটি কাজ করছে। ধাতুর পরিবর্তে কাচের রড নিয়ে পরীক্ষা করলে কিন্তু কাগজটি পুড়ে যাবে।

(ii) কাগজের একটা দোয়াত বা পাত্র তৈরি কর। এর মধ্যে কিছুটা জল ঢেলে বার্নার দিয়ে গরম করলে দেখবে, জল ফুটে স্টীম বেরুচ্ছে ; কিন্তু কাগজে আগুন ধরেনি (চিত্র 4.2)। যতক্ষণ কাগজের দোয়াতে জল থাকবে ততক্ষণ কাগজ পুড়বে না। প্রয়োজনে এ ব্যবস্থায় ডিমসেদ্ধও করা যায়। এখানে কাগজের অতিরিক্ত তাপটুকু জল গ্রহণ করে এবং কাগজটাকে 100°C উষ্ণতায় বেশি উত্তপ্ত হতে দেয় না। ফলে কাগজটা কখনও এমন উষ্ণতায় পেঁছায় না যে তা জ্বলে উঠতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে বাস্তব জীবনে কাজে লাগতে পারে, তাই বলছি খেলবার তাস দিয়ে বাক্স তৈরি করে তার মধ্যে সীসার টুক্‌রো রেখে তুমি তা গালিয়ে নিতে পার। সীসা তাপের সুপরিবাহী বলে দ্রুত বাক্সটার তাপ সেটি শোষণ করে নেয়। ফলে বাক্সটার উষ্ণতা সীসার গলনাঙ্ক 327°C-র বেশী উঠতে পারে না। এই উষ্ণতা বাক্সটায় আগুন ধরার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।



চিত্র—4.2

[তিন] কাগজ ছেঁড়োঃ এক সেণ্টিমিটার চওড়া ও প্রায় ত্রিশ সেণ্টিমিটার লম্বা একটা কাগজ জোগাড় কর। এবার এর যে কোন দুটো জায়গায় একটু করে কেটে দাও (চিত্র 4.3)। এই কাটার স্হান কিংবা গভীরতা তোমার ইচ্ছেমত করতে পার। এবার দুটি প্রান্ত ধরে টান। কি ঘটবে বলতে পার ?—কখনও তিনটি টুক্‌রোয় আলাদা করতে পারবে না। সব সময় দুটো। কারণ কখনই কাটার গভীরতা দুটি

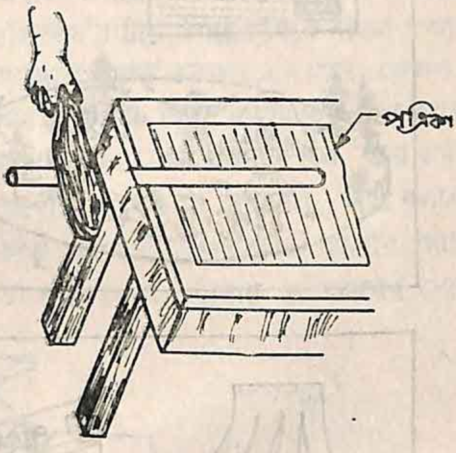


চিত্র—4.3

সম্পূর্ণ-রূপে এক হতে পারে না। তাই দুর্বলতর অংশটি আগে কেটে বেরিয়ে আসবে।

কাগজ ছেঁড়ার শব্দ নিবিষ্ট মনে কোনদিন শুনেছো কি ? —আচ্ছা, হাতে একটা কাগজ নাও। ধীরে ধীরে টানো অর্থাৎ ছেঁড়ো। এর শব্দ শোন। ঐ রকম আর একটা কাগজ নিয়ে দ্রুত ছেঁড়ো। কি ? এবারের শব্দটা কেমন ? শব্দের গুণগত মান বদ্‌লে গেছে—শুনলে ত ? কারণটা কি ? কারণটা কম্পনাংকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

[**চার**] **খবরের কাগজ** : (i) একটা খবরের কাগজের পাতা—কত আর ভারী হবে ? হাতের একটা আঙুলেই একে তুলে ধরা যায়। এবার একটা পরীক্ষা করেই দেখা যাক (চিত্র 4.4)। একটা মিটার স্কেলের মত কাঠের ছড়ি জোগাড় কর। টেবিলের উপর ঐ ছড়িটি রাখ যাতে কিছুটা অংশ টেবিলের কানার বাইরে বেরিয়ে থাকে। এবার ভাঁজ-টাঁজ খুলে ঐ খবরের কাগজটা দিয়ে টেবিলের উপর ছড়ির অংশটুকু ভাল করে ঢাকা দাও। একটা মুগুর জাতীয় ভারী পদার্থ জোগাড় কর। সজোরে এবং হঠাৎ টেবিলের বাইরে বেরিয়ে থাকা ছড়ির অংশে ঐ মুগুর দিয়ে আঘাত কর। দেখবে খবরের কাগজ ঢাকা দিয়ে টেবিলের উপর ছড়িটি যেমন ছিল তেমনি আছে, বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশ টেবিলের কানার কাছ থেকে ভেঙে নিচে পড়ে গেছে। খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা খবরের কাগজটি বায়ুমণ্ডলের চাপের দৌলতে কতটা ভারী হয়ে গেছে বুঝতে পারলে ত ?



চিত্র — 4.4

(ii) একটা খবরের কাগজের পাতা একটু গরম করে নাও। এবার কাপড় ঝাড়া ব্রাশ দিয়ে কাগজটি ঘষ (শীতকালে শুক্‌নো হাত দিয়ে ঘষলেও চলবে)। এখন এটিকে টুক্‌রো কাগজ বা কাগজের খেলনার কাছে আনলে দেখবে সেগুলি লাফাতে শুরু করবে। কেউবা একদম কাগজের উপর

এসে পড়ে চিটিয়ে যাবে। ঐ কাগজটি মাথার শুক্‌নো চুলের কাছে ধরলে চুলগুলো সোজা খাড়া হয়ে যাবে। মাথায় একটা শির্‌শিরে শিহরণও

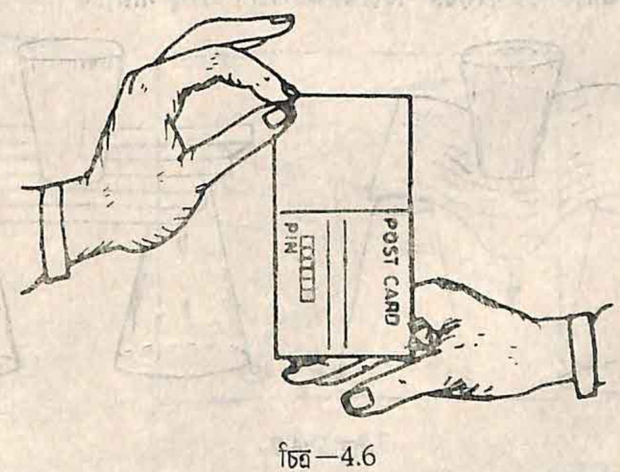


চিত্র—4.5

অনুভব করবে। ট্যাপের জলের ধারার সামনে আনলে দেখবে খবরের

কাগজটির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত ধারাটি এগিয়ে আসতে চাইছে। এবার যদি একটা কাঁচি দিয়ে লম্বা লম্বা করে কাগজটি কেটে একসঙ্গে গোছা করে ধর তাহলে কিন্তু আর আকর্ষণ নয়, লম্বা লম্বা কাগজের ফালিগুলি পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে। এসব স্থির তড়িতের অধ্যায়ের বিষয়। পড়তে ইচ্ছে হলে ক্লাসের বইটা দেখে নিও। 4.5 নং চিত্রে খবরের কাগজ দিয়ে পরীক্ষাগুলির নক্শা দেখানো হল।

[পাঁচ] **পোস্টকার্ড পরীক্ষা** ঃ একটা পোস্টকার্ড জোগাড় করো। বামহাতের দুটি আঙুলে সেটি ধরো। ডান হাতের দুটি আঙুল দিয়ে "পড়লেই ধরবে" এরকম ভাব নিয়ে পোস্টকার্ডের তলার দিকে না ছুঁয়ে ধরার জন্য তৈরি থেকো। এবার উপরে থাকা বাম হাতের আঙুল ঢিলে করা মাত্রই পোস্টকার্ড অভিকর্ষের টানে নিচের দিকে পড়ল ; আর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের দুটি আঙুল কিন্তু তাকে চেপে ধরে ফেলল। তুমি নিজে করলে এটা সবসময় ঘটবে। কিন্তু এবার তুমি বাম হাতে যেমন ধরে আছ তেমনি ধরে থাক। তোমার বন্ধুকে বল, তার ডানহাতটি তুমি যেমন যেভাবে রেখেছিলে সেভাবে রাখতে। আর বলবে, "আমি ছাড়া মাত্রই, তুমি কিন্তু ধরবে।" পরীক্ষাটা যতবার করবে ততবারই তোমার বন্ধু ধরতে পারবে না। আর প্রতিবারের শেষে



চিত্র—4.6

বলবে, "আর একবার কর ; এবার কিন্তু ধরবই"। আবার ফেল ! —কারণ কি ?—কারণ প্রথম ক্ষেত্রে দুটি হাতের একটি মাথা, যা

উভয় হাতকেই নির্দেশ দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুটি হাতের চালক হল দুটি ভিন্ন মাথা। এদের মধ্যে তাই নির্দেশদানের মধ্যে সময়ের একটা প্রভেদ থেকেই যায় কিংবা বলা যায় সমন্বয়ের অভাব হয়। যার ফলশ্রুতিতে এরকম একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা (চিত্র 4.6) পোস্টকার্ড দিয়েই করা গেল।

প্রঃ—কাগজের শক্তি কত ?

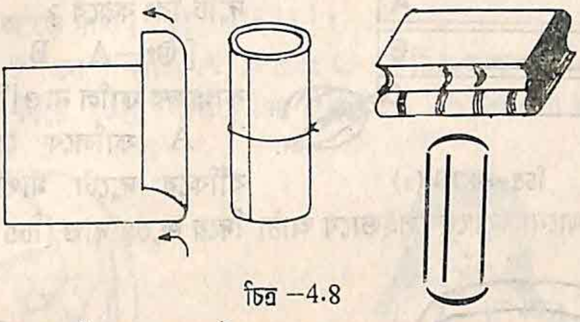
[উঃ—এ প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা দিয়েই দেওয়া যাক্। প্রথম পরীক্ষায় দুটো গ্লাস পাশাপাশি উপুড় করে রেখে তার উপর এক তা কাগজ ফেল। অর্থাৎ এখানে কাগজটা দুটি গ্লাসের মাঝে সেতুর কাজ করে। এবার তৃতীয় গ্লাসটা ঐ কাগজ সেতুর উপর বসালে, তা হুড়মুড় করে পড়ে যাবে—এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা কাগজটাকে এবার কতকগুলি ভাঁজ করে ঢেউখেলানো আকার করে নাও—দেখে অ্যাসবেসটসের ছাদ বা করোগেটের টিনের কথা মনে পড়বে। ঢেউখেলানো কাগজটাকে আবার চাপাও দুটি গ্লাসের মাঝখানে। এবারে ঐ কাগজের উপর গেলাস রাখলে তা কিন্তু দিব্যি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে (চিত্র-4.7)। ঢেউখেলানো কাগজের ক্ষেত্রে গ্লাসের ওজনটা পড়ে কাগজের কয়েকটা খাড়া দেওয়ালের উপর এবং সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে দেওয়ালের ঢালু গায়।



চিত্র—4.7

পাতলা কাগজের ক্ষমতা আর একটা পরীক্ষা করে বোঝা যেতে পারে। কাগজের তা-টিকে গোল করে প্যাঁকিয়ে নিয়ে তাতে

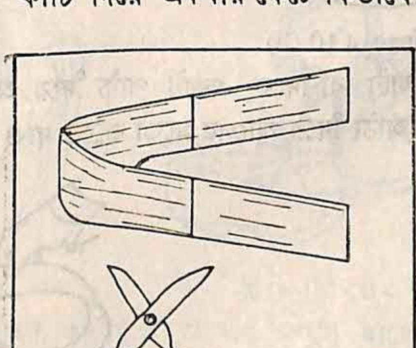
আটকে একটা চোঙ বানাও। দেখবে এই চোঙের উপর মোটা-সোটা কয়েকটা বই চাপিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসেই (চিত্র 4.8)। ফাঁপা



চিত্র —4.8

চোঙ হাল্‌কা কিন্তু যথেষ্ট ওজন বা মোচড় সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। তাই বেশীর ভাগ যন্ত্রে ফাঁপা ধাতব টিউব ব্যবহার করা হয়। জেনে রাখো আমাদের শরীরের হাড়গুলি ফাঁপা বলে এত ওজন বা মোচড় সহ্য করতে পারি ; নিরেট হলে কিন্তু নিজের ভারেই চলতে, ফিরতে ঘুরতে কষ্ট হত। যাই হোক্, যে কাগজকে আপাতদৃষ্টিতে বহনক্ষমতা নেই বলে মনে হয় সেই কাগজই ভাঁজ করা বা চোঙ করা অবস্থায় কেমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে—দেখলেতো ? (চিত্র 4.8)]

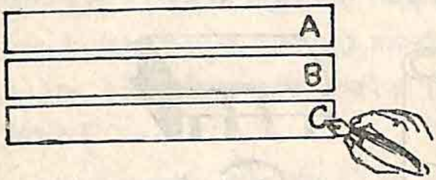
প্রঃ—একটা ত্রিশ সেন্টিমিটার মত লম্বা একটা কাগজের ফিতে তোমাকে দেওয়া হল। কাঁচি দিয়ে একবার কেটে কিভাবে সমান তিনটি টুক্‌রো করবে ?



চিত্র—4.9

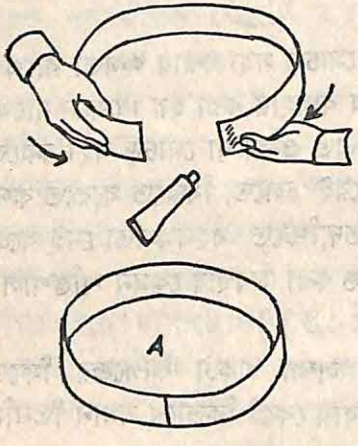
[উঃ—ভাঁজ করে নাও। এবার আন্দাজে দেখে নির্দিষ্ট জায়গায় কাঁচি চালাও। কি তিনভাগ হল ? 4.9 ছবিটা দেখে নাও।]

প্রঃ—কাগজের রিং তৈরি করে তা থেকে কিভাবে দুটি আলাদা রিং, একটা বড় রিং এবং শেকলবদ্ধ দুটি রিং করবে ?

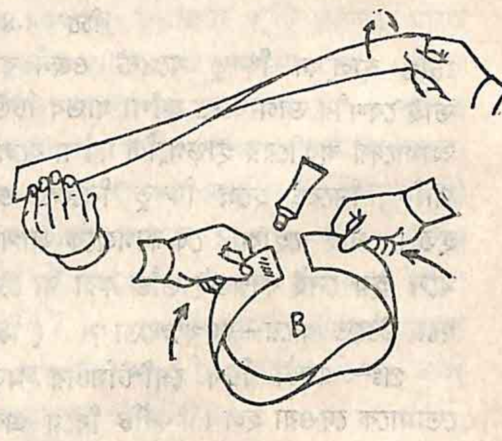


চিত্র—4.10 (a)

[উঃ—A, B, C, তিনটি কাগজের ফালি নাও [চিত্র 4.10(a)। A ফালিকে গোল করে বাঁকিয়ে দুটো মাথা যেভাবে ছবিতে দেখানো হয়েছে সেইভাবে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও [চিত্র 4.10 (b)।]

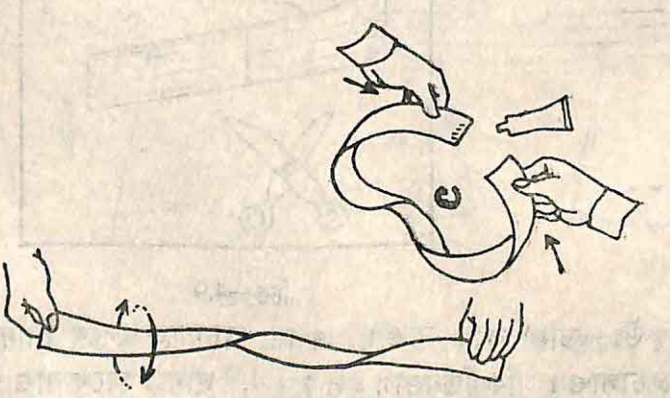


চিত্র—4.10 (b)



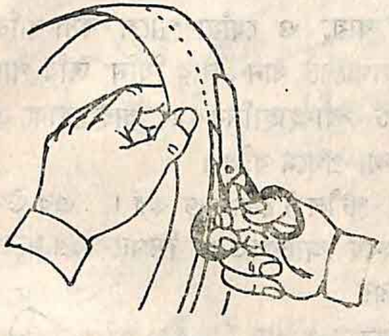
চিত্র—4.10 (c)

B ফালিটা বাঁ-দিকে একটা প্যাঁচ দিয়ে অর্থাৎ (180 ডিগ্রি) বাঁকিয়ে দুটো মাথা আঠা দিয়ে আগের মতো জুড়ে দাও [চিত্র 4.10(c) ।



এবার C ফালিটা B ফালির মতো পর-পর দু'বার প্যাঁচ দিয়ে অর্থাৎ (360 ডিগ্রি) বাঁকিয়ে স্ট্রিপের দু'দিকের মাথা পূর্বের মতো একইভাবে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও [চিত্র 4.10(d)]।

এবার এই তিনটে ফালি A, B এবং C-এর ঠিক মাঝখান দিয়ে সমান করে কাঁচি দিয়ে কেটে নাও [চিত্র 10(e)]। A ফালিটা কাটার পর

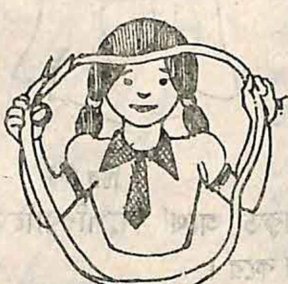


চিত্র—(e)10 4



চিত্র – (f)10.4

দেখবে দু'খানা একই পরিধির বৃত্ত তৈরি হয়েছে [চিত্র 4.10(f)। B ফালিটা কাটার পর দেখবে ঠিক দ্বিগুণ মাপের একটা বৃত্ত হল [চিত্র



চিত্র—(g) 10.4



চিত্র—(h) 10.4

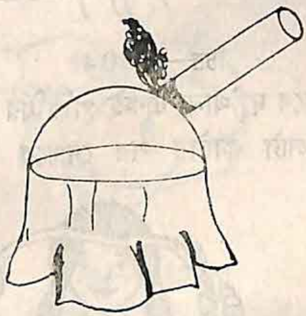
4.10(g)। আর শেষ ফালিটা কাটার পর দেখবে দ্বিগুণ মাপের দুখানা বৃত্ত তৈরি হয়েছে, তবে একটার সঙ্গে আর একটা শিকলের মতো আটকে রয়েছে [চিত্র 4.10(h)]।

কাগজ কাটার মজাদার পরীক্ষাটির আবিষ্কর্তা হলেন গত শতব্দীর বিখ্যাত জার্মান জ্যোতির্বিদ্ অগাস্টাস ফার্দিনান্দ মোরিয়াস। এটি "মোরিয়াস স্ট্রিপ" নামে সুপরিচিত।

5. সিগারেট-দেশলাই

সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই সিগারেটের সামনে যে আগুন তার উষ্ণতা খুব বেশি। এত বেশি উষ্ণতায় সংলগ্ন বায়ু আয়নীভূত হয়ে যায়। ঐ বায়ু ও ধোঁয়া পাশে বসা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর। অর্থাৎ যিনি সিগারেট খান আর যিনি তাঁর পাশে বসে থাকেন, উভয়ের ক্ষেত্রেই বিষয়টি স্বাস্থ্যহানিকর। যাই হোক, এই সিগারেট দিয়ে কয়েকটি পরীক্ষার কথা প্রথমে বলি।

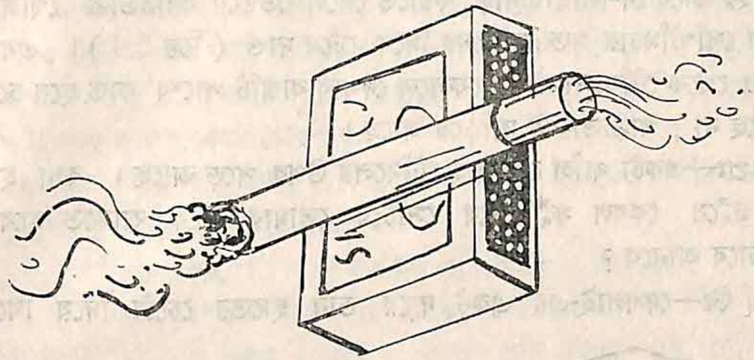
একটা বাটি (কাঁসা, পিতল বা স্টীল) জোগাড় কর। এর উপর ফিনফিনে ধুতির টুক্রো টান টান করে আটকাও। সিগারেটের মুখের আগুনের ছেঁকা এবার বাটির উপরের কপড়ে লাগাও। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখ (চিত্র 5.1)। এবার তোল। দেখবে ফিন্-ফিনে ধুতিটা একদম পোড়েনি। অনেকক্ষেত্রে মসৃণ পাথরের আংটির উপর ধুতির অংশ চাপিয়ে সিগারেটের ছেঁকা বা আগুন লাগিয়ে দেখানো হয় "ধুতি পুড়ল না।" বলা হয়, এটার জন্য আংটির দৈবগুণই কাজ করছে। প্রকৃত অর্থে সুপরিবাহিতা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মসৃণতা এই ঘটনায় কাজ করে।



চিত্র 5·1

একটা সিগারেট কিছুক্ষণ টানার পর জ্বলন্ত অবস্থায় দেশলাই-এর উপর রেখে দিলে দেখা যায় জ্বলন্ত মুখ থেকে নির্গত ধোঁয়া উপর দিকে উঠছে আর অন্য প্রান্তের দিক দিয়ে বেরুনো ধোঁয়া নিচের দিকে যাচ্ছে (চিত্র 5.2)। কেন এমনটা হয় ? তোমাদের এটি পরীক্ষা করে দেখতে বলছি না। পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করলাম—উত্তরটুকু বল। যে প্রান্তটা জ্বলছে তার উপর দিকে উষ্ণবায়ুর একটা ঊর্ধ্বগামী স্রোত রয়েছে। সেটাই ধোঁয়ার কণাগুলোকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে উপরে।

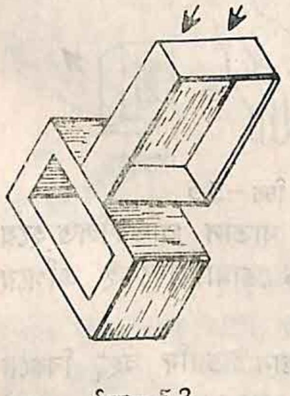
অন্য প্রান্তে ধোঁয়া বহনকারী বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসে। এই



চিত্র 5.2

ধোঁয়ার কণাগুলো বাতাসের চেয়ে ভারী, তাই ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে আসে।

একটা খালি দেশলাই বাক্স জোগাড় কর। 5.3 ছবির মত করে ভেতরটা খুলে নিয়ে সাজাও। অর্থাৎ বাইরের খোলটা খাড়াভাবে নিচে রেখে তার উপর খাড়া করেই ভিতরের কাঠি রাখার খোলটা দাঁড় করাও (চিত্র 5.3)। এবার উপর থেকে সজোরে একটা ঘুষি সাজানো দেশলাই-এর মাথার উপর মারো। কি? সব চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল?—না, দেখবে দুটি খণ্ড লাফিয়ে ছিট্‌কে গিয়ে দূরে পড়েছে। এবং দুটো খণ্ডই সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। তোমার ভাবনার সঙ্গে পরীক্ষার ফলটা মিলল না দেখে খুশিই হবে। এখানে



চিত্র—5.3

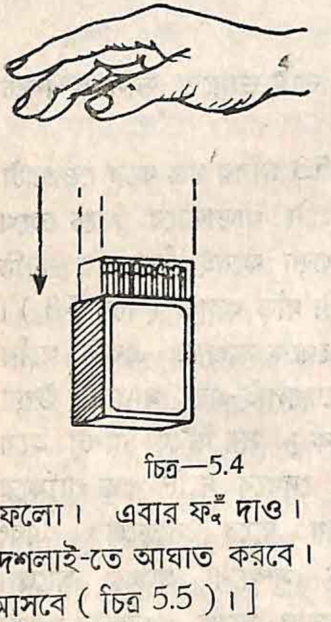
বাক্সটি স্প্রিং-ক্রিয়ার দ্বারা রক্ষা পায়—আঘাতে বেঁকে যায় কিন্তু ভেঙে যায় না।

কাঠিভর্তি একটা দেশলাই নিয়ে খাড়া ভাবে একটি টেবিলের প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার উপরে ধর। এবার ছেড়ে দিয়ে চেষ্টা কর যাতে দেশলাইটি টেবিলের উপর পড়ে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার চেষ্টা করে বিফল হবে। প্রতিবারে দেশলাইটা পড়ে উল্টে যাচ্ছে;

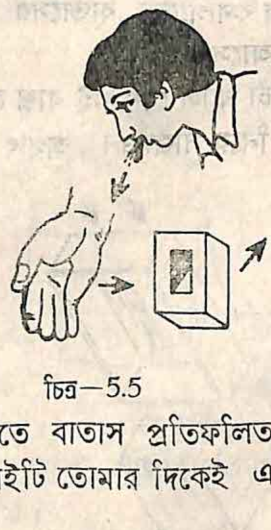
কিছুতেই খাড়া অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে না। তাহলে কিভাবে করবে ? খাড়া সুস্থির ভাবে দেশলাইটি দাঁড় করাতে গেলে ভেতরে কাঠিভর্তি খোলটি তিন সেণ্টিমিটার মত সামনের দিকে টেনে দাও (চিত্র 5.4)। এবার উপর থেকে টেবিলের উপর ফেললে দেখবে বাক্সটি পার্শ্বে কাত হয়ে ঢলে পড়ছে না ; খাড়াভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রঃ—একটা খালি দেশলাই টেবিলের উপর পড়ে আছে। বলা হল না ছুঁয়ে কেবল ফুঁ দিয়ে সেটিকে তোমার দিকে আনতে হবে। কিভাবে আনবে ?

[উঃ—দেশলাই-এর একটু দূরে ডান হাতের চেটো দিয়ে ঘিরে



চিত্র—5.4



চিত্র—5.5

ফেলো। এবার ফুঁ দাও। তোমার চেটোতে বাতাস প্রতিফলিত হয়ে দেশলাই-তে আঘাত করবে। এতে দেশলাইটি তোমার দিকেই এগিয়ে আসবে (চিত্র 5.5)।]

প্রঃ—ম্যাজিক, অঙ্ক, জ্যামিতি, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়ে দেশলাই কাঠি একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। এখানে একটি কাঠি বিষয়ে পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষাটিতে উত্তর কত হবে বলতে হবে।

(i) তোমার কোন বন্ধুর সামনে 21 থেকে 25টির মত দেশলাই কাঠি রাখ। দূর থেকে চোখ বন্ধ করে তাকে বল, ঐ কাঠিগুলো থেকে 10-এর মধ্যে যে কোন সংখ্যক কাঠি নিয়ে সে যেন তার পকেটে পুরে।

(ii) এবার যা পড়ে থাকল তাকে গুণতে বল এবং সে দু'অঙ্কের একটি সংখ্যা পাবে। ঐ সংখ্যা দুটি যোগ করতে বল এবং যোগফল যা হবে সেই সংখ্যক কাঠি আবার তার পকেটে ঢোকাতে বল। উদাহরণ স্বরূপ সে যদি 15টি কাঠি গুণে. তাহলে 1+5=6টি কাঠি নিয়ে সে দ্বিতীয় বার তার পকেটে ঢোকাবে।

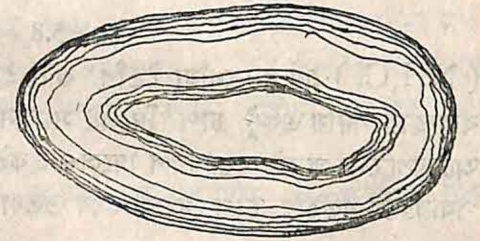
(iii) এবার পড়ে থাকা কাঠিগুলি থেকে সে ইচ্ছেমত কাঠি নিয়ে তাঁর হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখল।

বলতে হবে—বন্ধুটি হাতের মুঠোয় কটি কাঠি লুকিয়েছে ?

[উঃ—এখানে দ্বিতীয় বার কাঠি নিয়ে পকেটে রাখার পর সব সময়ই ন'টি কাঠি টেবিলে পড়ে থাকবে। এখন যদি দেখা যায়, টেবিলে



চিত্র—5.6



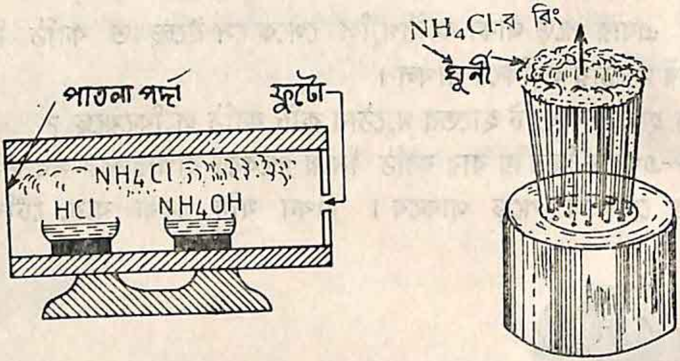
চিত্র – 5.7

তিনটি কাঠি পড়ে আছে, তাহলে মুঠোর মধ্যে নিশ্চয়ই (9−3)=6টি কাঠি রয়েছে। অর্থাৎ (9−যতগুলি কাঠি টেবিলে পড়ে আছে)-সংখ্যক কাঠি হাতের মুঠোয় লুকানো হয়েছে। (চিত্র 5.6)]

প্রঃ—সিগারেটের ধোঁয়া মুখে ভর্তি করে বিশেষ কায়দায় রিং আকারে তাকে ছাড়া যায়। এই রিং-এর ফটো তুলে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রিংটি ডজনখানেক ধোঁয়ার স্তর এবং স্বচ্ছ বায়ুর স্তরের পেঁচানো এক বিশেষ ব্যবস্থা (চিত্র 5.7)। এই ব্যবস্থা বিশ্লেষণে ঘূর্ণী সংক্রান্ত বিজ্ঞান জানা যায়। এখন সিগারেট খাওয়া বন্ধ।

তাই অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ধোঁয়া তৈরি করা হয় এবং রিং তৈরি করা হয় যান্ত্রিক ব্যবস্হায়। জান কি ? কিভাবে করা যায় ?

[উঃ—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH)-এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড



চিত্র – 5.8

(NH_4Cl)-এর ঘন ধোঁয়া তৈরি করা হয়। এবার চিত্র 5.8-এর মত ব্যবস্হায় পর্দায় একটু চাপ দিলেই সামনের ফ্‌টো দিয়ে রিং বেরোয়। অনেকগ্‌লো ফ্‌টো করে চাপ দিলেও একই ধরনের স্‌ন্দর রিং বেরোবে। পর্যায়ক্রমে যতবার চাপ দেওয়া হবে ততবারই রিং বের্‌বে।]

6. আজি পরীক্ষা কাঁচা কিংবা সেদ্ধ ডিমের

খাদ্য তালিকায় ডিম একটি বিশেষ স্থান দখল করে। ডিমের সাইজ অংক বিজ্ঞানের ভাষায়—ইলিপ্‌সয়েড (ellipsoid)। এর আংকিক জটিলতা, অংক নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে অজানা নয়। হাঁস বা মুরগীর ডিমে মোটামুটি খাদ্যগুণ প্রায় একই রকম। প্রতি একশ গ্রামে ক্যালরি মান প্রায় একশ' আশি, এছাড়া প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন এ, বি ইত্যাদি রয়েছে। এককথায় ডিম একটি সুষম আহার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—মাংস বেশি সেদ্ধ করলে তার খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ডিমের কুসুম বেশী উত্তাপে সংকুচিত হয় না। তাই ডিম সেদ্ধ করলে খাদ্যগুণের হেরফের ঘটে না। ডিমের সাদা অংশে অ্যাভিডিন নামে একটি যৌগ আছে যা শরীরের বায়োটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। ফলে শরীরে বায়োটিনের অভাব দেখা দিতে পারে। তবে ডিম কিছুটা গরম করলেই অ্যাভোডিন নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাঁচা ডিম না খাওয়া ভাল। ডিম প্রসঙ্গে রাস্তাঘাটে প্রায়ই কিছু প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যেমন, বাওয়া ডিম কিভাবে হয় ?

বাওয়া ডিম বা পোল্‌ট্রির ডিমের তুলনায় দেশী হাঁস-মুরগীর ডিম ভাল—কথাটা কি সত্যি ?

—বাওয়া কথাটির আক্ষরিক অর্থ নিষ্ফলা। বাওয়া ডিম হল সেই ডিম যে ডিম ফুটে বাচচা হয় না। পাখীর বাম ডিম্বাশয়ে (ovary) ডিমের (ovum) সৃষ্টি হয় এবং বৃদ্ধি হয়। পাখীর ডানদিকে ডিম্বাশয় বা ডিম্বনালি থাকে না। আমরা যাকে ডিমের কুসুম (হলুদ অংশ) বলি সেটাই কেবল তখন তৈরি হয়। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক নিয়মে ডিম্বনালী ধরে সেটা নেমে এসে পায়ুর (cloaca) উপরের অংশে উপস্থিত হয়। ডিম্বনালী ধরে নেমে আসার সময় ঐ ডিম্বনালীতে ঐ হলুদ অংশের চারধারে একটা থলথলে প্রায় স্বচ্ছ পদার্থের আস্তরণ (albumen) জমা হয় (ডিম সেদ্ধ হলে কুসুমের চারধারে যে সাদা অংশ দেখা যায়)। তারপর ঐ থলথলে পদার্থের উপর একটা সাদা পর্দা তৈরি হয়। ঐপর্দার ভেতরে সামান্য বাতাস জমা থাকে, আর পর্দাকে

ঘিরে জমা হয় চুনজাতীয় ক্যালসিয়ামঘটিত একপ্রকার যৌগ পদার্থ যাকে আমরা বলি ডিমের খোসা। পরিশেষে পরিপূর্ণ ডিম পায়ুপথ ধরে বেরিয়ে আসে। এই হল বাওয়া ডিম সৃষ্টির বিবর্তনের ধারা।

ডিম যখন প্রাথমিক অবস্থায় (কেবলমাত্র কুসুম) ডিম্বনালীতে অবস্থান করছে, তখন যদি পুরুষ পাখির সাথে মিলনের ফলে শুক্রাণু ডিমের কুসুমে প্রবেশ করে, তাহলে পাখি যে ডিম পাড়বে সেটা হল নিষিক্ত (fertilised) ডিম, আর যদি শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত না হয়ে বেরোয় তাহলে তার নাম বাওয়া ডিম। পরীক্ষা বলে, নিষিক্ত ডিম ও বাওয়া ডিমের খাদ্যগুণ একই। দেশী মুরগী বাগানে চরে কাঁচপাতা-লতাঘাস খায় তাই এদের কুসুমে ভিটামিন-এর অগ্রদূত ক্যারোটিন থাকে। সেকারণে দেশী ডিমের কুসুম গাঢ় হলুদ। পোল্ট্রির ডিমে ভিটামিন এ থাকে, কিন্তু ক্যারোটিন থাকে না—তাই এর কুসুম ফিকে হলুদ রঙের হয়। ক্যারোটিনের রং হলুদ এবং ভিটামিনের রং সাদা। তবে খাদ্যগুণ বিচারে দুরকম ডিমই সমতুল্য। বরং পোল্ট্রির হাঁস মুরগী সুষম তৈরি করা খাবার নিয়মমাফিক খায় বলে পোল্ট্রির ডিম সুষম গুণ-সমন্বিত হয়। যাইহোক্, ডিম নিয়ে আমাদের স্বভাবজাত অনুসন্ধিৎসা রয়েছে, তাই এতক্ষণ পুষ্টি ও প্রাণবিজ্ঞান নিয়ে সাধারণ ধারণার অবতারণা করলাম।

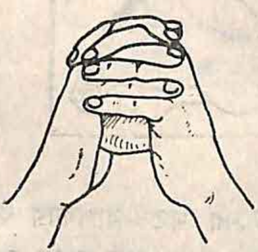


চিত্র—6·1

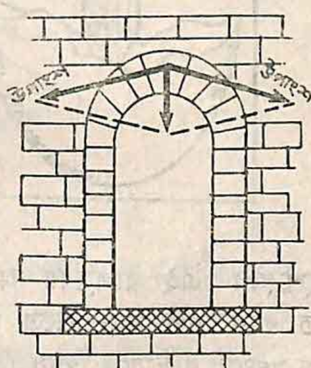
ডিমটা ভাল আছে নাকি দেখুন ত ?—বললে দোকানদার ডিমটাকে একটা বাল্বের কাছে ধরে (চিত্র-6.1) এবং বলে, “ঠিক আছে”। কিভাবে বলে ? এই পরীক্ষাটিকে বলা যায় “ক্যাণ্ডেল পরীক্ষা”। ডিমের সাদা খোলার ভেতরে থাকে সাদা সঠিক অর্থে স্বচ্ছ অ্যালবুমিন, আর হলুদ রঙা কুসুম। তাজা ডিমের অ্যালবুমিন যথেষ্ট ঘন থাকে। তাই ডিমটি তাজা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ডিমটি আলোর সামনে

ধরলে, সমপরিমাণ উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট লালচে আভা সমগ্র ডিমটি জুড়ে প্রায় দেখা যাবে। ডিম পুরানো বা পচা হলে অ্যালবুমিন পাতলা হয়ে পড়ে, কুসুমও আকারে অনেক সময়ই বড় এবং ঘন হয়। এক্ষেত্রে হাতে নিয়ে ডিম ঝাঁকালে বোঝা যাবে ভেতরে কিছু একটা নড়ছে। বাতি বা বাল্‌বের সামনে এ ধরনের ডিম ধরলে পরে, তার মধ্য দিয়ে আলো ভালো ডিমের মতো সব জায়গা দিয়ে সমানভাবে ভেদ করে আসতে পারবে না—পাতলা অ্যালবুমিনের তুলনায় গাঢ় কুসুমে বাধা পাবে বেশি। ফলে পচা ডিমের মধ্যে একটা জায়গায় তুলনামূলকভাবে অন্ধকার গাঢ় একটি ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এটাই হল ডিম ভাল-খারাপ চেনার পরীক্ষা।

এবার কাঁচা ডিমের একটা পরীক্ষায় আসা যাক্। ডিমকে লম্বালম্বি দুটি হাতের তালুর মধ্যে রেখে চাপ দাও (চিত্র-6.2)। কি ভাঙতে



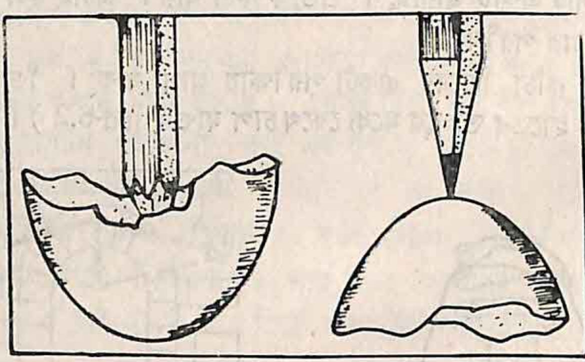
চিত্র—6·2



চিত্র—6.3

পারলে ? সহজে পারবে না। এটা ভাঙতে বেশ জোরের দরকার হবে। সাধারণভাবে ডিমের খোলা যতটা ভাঙা সহজ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ডিমের খোলা অত শক্ত কেন ? একমাত্রওটা বক্র আকারের বলে। পুরানো মন্দিরের খিলান বা আর্চও ঐ একই কারণে শক্ত। এক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল বিভিন্ন উপাংশে ভেঙে যায়। খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়াশীল বল উপাংশের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কাঠের তৈরি একটা ডাইনিং টেবিলের চারটে পায়ার নিচে চারটে ডিম রেখে দেখা গেছে ডিমগুলি ভেঙে যায় না। এক্ষেত্রে প্লাস্টার অফ প্যারিসের উপর ডিমগুলো বসিয়ে নিলে ভাল হয়।

বিপরীতপক্ষে খিলান বা আর্চকে সহজেই ভাঙা যাবে যদি ভেতরের দিক থেকে উপরের দিকে বল প্রয়োগ করা হয়। ডিমের খোলাও আর্চ বিশেষ। তাই বাইরের থেকে চাপ দিয়ে একে সহজে ভাঙা যায় না। সেজন্য ডিমে তা দেওয়ার সময় মুরগীর সব ওজনটা পড়া সত্ত্বেও ডিম ভেঙে যায় না। অথচ অতিদুর্বল মুরগীর বাচ্চারা ডিমের ভেতর থেকে খোলা ভেঙে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে। ডিমের খোলা ও পেন্সিল দিয়ে হাতে নাতে নিজে সহজ পরীক্ষা করে দেখতে পার (চিত্র-6.4)। বাড়ীতে যে তড়িৎ বাল্ব জ্বলে ; সেই বাল্বগুলি আংশিক



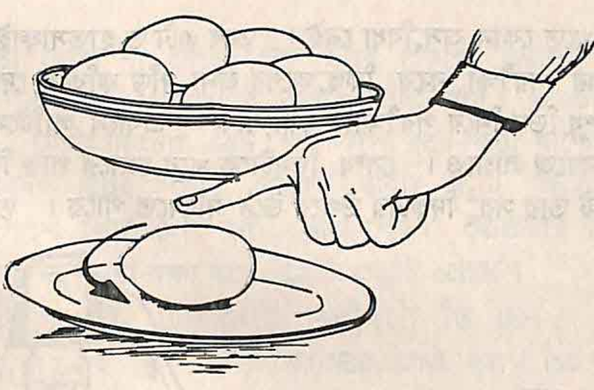
চিত্র—6.4

বায়ুশূন্য। এই বাল্বের আকৃতিও ডিমের মত বক্রাকার করা হয়, যাতে করে চাপ সহ্য করতে পারে। ভাবলে অবাক লাগে একটা 10 সেমি চওড়ার বাল্বকে প্রায় 75 কেজি বায়ুর চাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। একই কারণে টিভি-র পর্দা উত্তল করতে হয়। টিভি-র পিক্চার টিউব বায়ুশূন্য। তাই প্রতিপ্রভ পর্দাটিকে বায়ুর চাপ সহ্য করতে হবে। যাতে না ভেঙে যায়, তাই পর্দার আকৃতি উত্তল করতে হয়। যদি টিভির পর্দার ক্ষেত্রফল 730 বর্গ সেমি হয়, তাহলে ঐ কাচের প্রতিপ্রভ পর্দার উপর প্রায় 730 কেজি বল প্রযুক্ত হয়। উত্তল পর্দাকে এটি সামাল দিতে হয়। ডিম প্রসঙ্গে পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি বাস্তব বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

এবার খাওয়ার টেবিলে আসা যাক্। টেবিলে একটা বাটিতে অনেকগুলো ডিম রাখা আছে। মা বলল, ভুলে কাঁচা আর সেদ্ধডিম মেশা-মেশি হয়ে গেছে। কি করা যায় বলত ?—কেন' ভেঙে দেখলেই

ত হয়! কিন্তু না ভেঙে কি কাঁচা-সেদ্ধ পৃথক করা যাবে না? —নিশ্চয়ই যাবে। পরীক্ষা শুরু কর।

একটা চ্যাপ্টা থালা নাও। থালার উপর এক একটা ডিম আনো আর পাক খাওয়াও। সেদ্ধডিম কাঁচা ডিমের চেয়ে অনেক দ্রুত ও অনেক্ষণ ধরে ঘুরবে। সত্যি বলতে কি, কাঁচা ডিমকে পাক খাওয়ানোই শক্ত। কাঁচা ডিমের তরল অংশ ডিমের গতির বিপরীতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই দু চার পাক ঘোরার পরই থেমে যায়। তাছাড়া কাঁচা-সেদ্ধ চেনার উপায় ঘূর্ণন থামার প্রকৃতি থেকেও জানা যায়। ঘুরন্ত সেদ্ধ ডিমে একটা আঙুল ছোঁয়ানোমাত্র সেটা থেমে যায়। কিন্তু কাঁচা



চিত্র—6·5

ডিমের ক্ষেত্রে আঙুল ছুঁয়ে থামিয়ে দেওয়ার পরেও কিছুক্ষণ ঘোরে (চিত্র 6.5)। এখানেও জাড্যধর্ম কাজ করছে। আঙুল ছোঁয়ানোতে শক্ত খোলাটা স্থির অবস্থায় আসার পরেও কাঁচা ডিমের ভিতরের তরল অংশ ঘুরতেই থাকে। সেদ্ধ ডিমের ক্ষেত্রে কিন্তু বাইরের খোলা সমেত ভিতরের অংশের ঘূর্ণন একসংগেই বন্ধ হয়ে যায়। কি—না ভেঙে কাঁচাডিম, সেদ্ধডিম আলাদা করা গেল? ইচ্ছে করলে ডিমে রবারের ব্যান্ড পরিয়ে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে পাক খাইয়ে পরীক্ষাটি করতে পার (চিত্র 6.6)। এখানেও কাঁচা ডিম পাক খাওয়া বন্ধ করবে আগে।

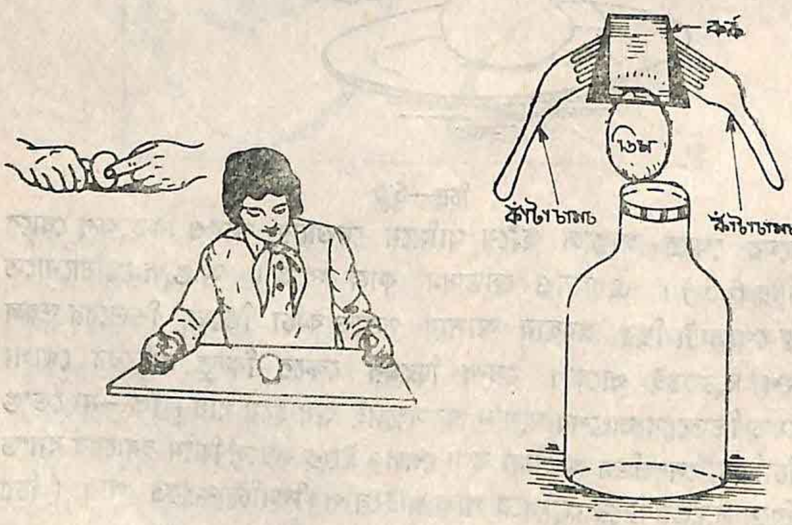
আচ্ছা, ডিমকে কি খাড়া টেবিলে বসিয়ে রাখা যাবে? অর্থাৎ, ডিমকে কি সরু দিকটার উপরে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে?—কোন এক যাদুকর এটি করেছিল। খাওয়ার টেবিলে টেবিল ক্লথ ছিল। কথায়

কথায় হাতসাফাই করে টেবিল ক্লথের তলায় কিছুটা খাওয়ার নুন এক ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এবার ত তার উপর ডিমকে খাড়া করে দাঁড়



চিত্র—6.6

করিয়ে রাখতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা ত হাতসাফাই। কিন্তু সত্যিকারের পরীক্ষা করে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। প্রথমে সেদ্ধ ডিম নিয়ে পরীক্ষাটি করা যাক। এখানে লাটিমের ঘূর্ণন-ধর্মটিকে কাজে লাগাও। সেদ্ধ ডিমটাকে খুব জোরে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে সেটি তার সরু দিকটার উপরে উঠে দাঁড়াতে পারে। তা না হলে



চিত্র—6.7

ডিমটাকে খাড়া করে ওর প্রান্তের উপর ঘোরাও। না পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্তত (যতক্ষণ ঘুরবে) ওটা ওর প্রান্তের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে (চিত্র-6.7)। যেহেতু কাঁচা ডিম ঘোরার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ

করে, তাই একে ঘুরিয়ে খাড়া ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। তাহলে কাঁচা ডিমকে কিভাবে খাড়াভাবে দাঁড় করানো যাবে? এটাও একটা পরীক্ষা করেই দেখানো যায়। ডিমটাকে অনেকবার খুব জোরে ঝাঁকাও যাতে ভিতরের কুসুমটা ঘেঁটে যায়। অর্থাৎ কুসুম আর অ্যালবুমিন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এবার ডিমটার ভোঁতামুখ টেবিলের উপরে রেখে বেশ কিছুক্ষণ ডিমটিকে খাড়া করে ধরে রাখো। ডিমের কুসুমের ঘনত্ব বেশী হওয়ায় এখন সেটি নিচের দিকে অর্থাৎ ভোঁতা প্রান্তে এসে জমা হবে। এর ফলে ডিমের ভরকেন্দ্র নিচের দিকে নামবে, যার ফলশ্রুতি হিসেবে দাঁড়ানো অবস্থায় সুস্থিরতা লাভ করা সম্ভব হবে।

তবে কাঁচা হোক বা সেদ্ধ হোক উভয় প্রকার ডিমকেই নিচের পদ্ধতিতে (চিত্র-6·7) খাড়াভাবে বসিয়ে রাখা যায়। একটা কর্ক জোগাড় কর। মোটা দিকটায় একটু কেটে ফাঁপা করে নাও, যাতে সেটি টুপির মত ডিমের উপর বসতে পারে। এবার দুটি কাঁটা চামচ ছিপিটির দুপাশে ঝোলাও। ব্যাস, কাজ শেষ। বোতলের কিনারে বসালেও দেখবে ভারসাম্য রক্ষা করে ডিমটি খাড়াই রয়েছে।

বোতলে সেদ্ধ ডিম ঢোকানোর পরীক্ষাটা কি জান? অর্থাৎ, বোতলের মুখে সেদ্ধ ডিম একটি ছাড়িয়ে রাখা হল (চিত্র-6.8)।



চিত্র—6.8

ঠেলে ঐটিকে বোতলের মধ্যে কিছুতে ঢোকাতে পারবে না। ঠেলে ঢোকাতে গেলেই ভিতরের বাতাস বাধা দেবে। তাহলে কিভাবে

ঢোকানো যাবে? দুটি বা তিনটি দেশলাই কাঠি একসংগে জ্বাল। জ্বলন্ত অবস্থায় কাঠিগুলি বোতলের মধ্যে ফেলে দাও, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ানো সেদ্ধ ডিমটি বোতলের মুখে রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেশলাই কাঠিগুলি নিভে যাবে, আর সেই ফাঁকে ডিমটি বাধ্য ছেলের মত সুড়্ সুড়্ করে বোতলের ভিতর ঢুকে পড়বে।

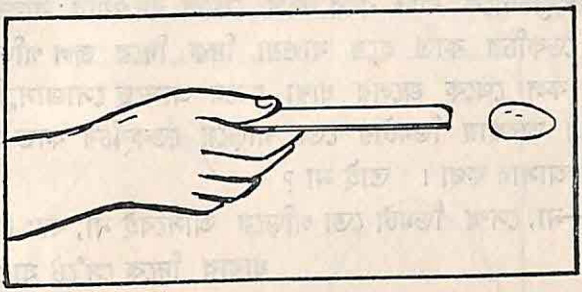
জ্বলন্ত কাঠি বোতলের ভেতরের অক্সিজেন খরচা করে ফেলায় ভেতরের বায়ুচাপ কমে গেছে। এছাড়া বোতলের ভিতরের কিছু গরম হাল্‌কা বাতাস মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়েও গেছে। তাই বাইরের অপেক্ষাকৃত বেশি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সেদ্ধ ডিমটিকে ঠেলে ভেতরে ঢোকায়। ডিমটিকে না হয় ঢোকানো হল। এবার বোতলের ভেতর থেকে সেদ্ধ ডিমটি বাইরে আনবে কি করে?—বোতল নাড়িয়ে ডিমটিকে মুখের কাছে আন (চিত্র-6.8)। এবার বোতলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে সজোরে ফুঁ দাও। ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরের বাতাস সঙ্কুচিত হয়, ফলে সেই বাতাসের চাপ বাড়ে। বোতলের ভেতরে বাতাসের চাপ যেহেতু বাইরের তুলনায় বেশি, তাই ভেতরের বাতাসের ধাক্কায় সেদ্ধ ডিমটি বাইরে চলে আসে।

প্রঃ—ছোট ফুটো করে কিভাবে কাঁচা ডিমের ভিতরের কুসুম ও সাদা অংশ বের করে নেওয়া যায়?

[উঃ—ডিমের উভয়প্রান্তে পরস্পরের দিকে মুখোমুখি দুটি ছোট গর্ত কর। প্রথম গর্তে জোরে ফুঁ দিলেই তরল পদার্থগুলি ক্রমশ অন্য গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এই খোলা বা খালি ডিম নিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা বা চটকদারি পরীক্ষা করা যায়। অনুসন্ধিৎসা নিরসনের জন্য দু'একটা উদাহরণ দিই। (i) দুটি খালি ডিমের খোলা নাও। একটির মধ্যে অর্ধেক বালি ভর্তি কর এবং বালির উপর কিছুটা আঠা ঢেলে দাও। অন্যটির মধ্যে প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশ লোহাগুঁড়ো ঢুকাও। ফুটো বন্ধ করো। দুটো ডিমের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখতে পাবে। একটা যে ভাবে নাড়াবে বা রাখবে সেভাবেই থাকবে, অন্যটি কিন্তু যেভাবেই নাড়াও না কেন সে গোঁয়ারের মতো ঠিক তার আগের অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসবে।

(ii) একটা খালি ডিমকে টেবিলের উপর রাখ। লোকে ভাববে

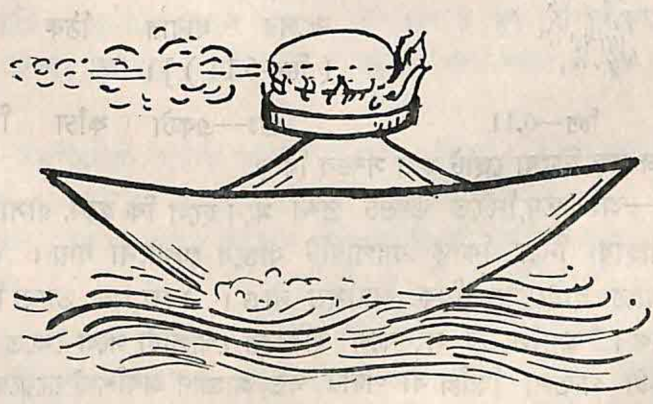
গোটা নিরেট একটি ডিম। এবার একটা গ্লাস রড বা গালার রড নাও। সিল্ক বা পশম দিয়ে রডটিকে বেশ কয়েকবার ঘষ। ঘর্ষণে স্থির



চিত্র—6.9

তড়িৎ তৈরি হবে। এবার ঐ রড নেড়ে দূর থেকে ডিমটিকে চালনা কর (চিত্র-6.9)।

(iii) কাগজের নৌকো করো, ফাঁপা ডিমের খোলে জল ঢুকাও। সামনের ফুটোটি বন্ধ করো। পিছনের ফুটো থাকবে। ডিমের তলায় টিনের ছোট ঢাকনা রাখ। সমগ্র ব্যবস্থাটি কাগজের নৌকোর উপর ঠিকমত বসিয়ে জলে ভাসাও। টিনের ঢাকনায় স্পিরিট ভেজানো তুলো

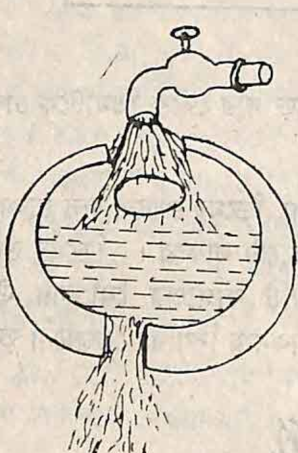


চিত্র—6.10

রেখে তাতে আগুন ধরাও। এবার ডিমের পিছনের ফুটো দিয়ে বাষ্প বেরোবে। আর জেট নীতি কিংবা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে ডিমের ইঞ্জিনসহ কাগজের নৌকো ছুটে চলবে (চিত্র-6.10)।

প্রঃ—কি ঘটবে বলতে পার ? একটা ডেক্‌চিভর্তি জলের মধ্যে একটা সেদ্ধ ডিম রাখ। ডেক্‌চিটাকে খোলা ট্যাপ বা কলের নিচে ধর। এবারে ডেক্‌চিটাকে কাত করে জল ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। একদিকে ডেকচির কাত হয়ে যাওয়া দিক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে কল থেকে জলের ধারা নেমে আসছে সোজাসুজি ডিমটার উপর। এ অবস্থায় ডিমটার তো গড়িয়ে ডেক্‌চির কাত হয়ে যাওয়া দিকে চলে আসার কথা। তাই না ?

[উঃ—না, সেদ্ধ ডিমটা তো গড়িয়ে আসবেই না, বরং সেটি কলের ধারার দিকে সেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ—কল থেকে ডেকচির যে পাশে জল পড়ছে সেখানে জলের চাপ কম (বেগ বাড়লে চাপ কমে, পরীক্ষার পড়ায় পড়বে) : সে তুলনায় আশে পাশে জলের চাপ বেশি হওয়ার দরুন—তা ডিমটাকে আটকে রাখছে ডেক্‌চির ঐ দিকটায়—অর্থাৎ জলের ধারার ঠিক নিচে (চিত্র-6.11)]।

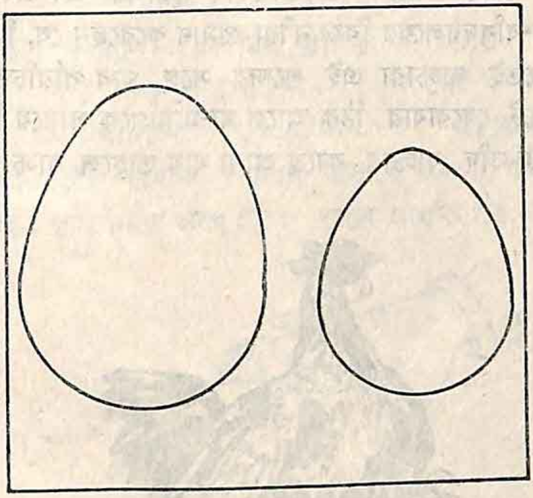


চিত্র —6.11

প্রঃ—একটা কাঁচা ডিমের সাইজ বড় কিংবা ছোট করা সম্ভব কি ?

[উঃ—আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট প্রশ্ন মনে হলে কি হবে, রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য নিয়ে কিন্তু ব্যাপারটি বাস্তবে দেখানো যায়। একটা কাচের পাত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাও। কিছুক্ষণ তাতে ডিমটা ডুবিয়ে রাখ। অ্যাসিডের সংস্পর্শে বাইরের খোলাটা গলে যেতে যেতে যখন একটা পাতলা ঝিল্লি বা পর্দার মত আস্তরণ অবশিষ্ট রয়েছে মনে হবে, সে অবস্থায় সাবধানে ডিমটি না তুলে পাত্রের অ্যাসিড গড়িয়ে ঢেলে দাও। এবার ঐ পাত্রটি বিশুদ্ধ জল দিয়ে ভর্তি কর। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঐ পাতলা পর্দা-ঘেরা কাঁচা ডিমটিকে ঐ জলের মধ্যে থাকতে দাও। প্রায় 24 ঘণ্টা পর লক্ষ্য করলে দেখবে ডিমটি ফুলে ঢোল হয়ে

গেছে (চিত্র-6.11)। তার আকৃতি প্রায় দেড়গুণ বেড়ে গেছে। এর পিছনে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি রয়েছে তার নাম ব্যাপন ক্রিয়া (osmosis)। এখানে পাতলা পর্দা দিয়ে জলের অণু ঢুকতে পারে কিন্তু



চিত্র—6·11

ডিমের ভিতরের তরল পদার্থের অণুগুলি বেরিয়ে আসতে পারে না। এখন পাত্রটি থেকে জল ফেলে দাও। ঐ জায়গায় মদ বা অ্যালকোহল ঢাল। ফোলা ডিম রোগা হয়ে আগের সাইজ ফিরে পাবে। কি কেমন মজা ?]

প্রঃ—সসপ্যানের ফুটন্ত জলে ডিম সেদ্ধ হচ্ছিল। এ অবস্থায় ডিমটি বের করে এনে তুমি হাতে ধরলে। গরম লাগছে, ঠিক কথা, কিন্তু ফুটন্ত জল যেভাবে হাতে ফোস্কা ফেলতে পারত সেরকম মোটেই হচ্ছে না কেন ?

[উঃ—সসপ্যান থেকে আনা ডিমের গায়ে জল লেগে থাকে। বাইরে আনলে এই জল বাষ্পীভূত হতে থাকে ; আর বাষ্পীভবনের লীন তাপ মূলত ডিমের গা থেকেই নেয়। সেকারণে হাত পুড়ে যায় না। যতক্ষণ না ডিমটির গা থেকে জল চলে যাচ্ছে ততক্ষণ হাতে ধরে রাখা যাবে ; খোলার বাইরের জল উবে গেলে কিন্তু হাতে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।]

জেনে রেখো ঃ ডিমের ভেতরেই কান খাড়া ঃ

মুরগি যখন ডিমে তা দেয় তখন তারা মুখ টিপে একরকম 'বিপ্-বিপ্' শব্দ করে যা হয়তো কানে শোনা যায় না, কিন্তু মুরগির গায়ে কান রাখলে বোঝা যায়। এক-একটা মুরগির এক-একরকম শব্দ। ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, ডিমের ভেতর থাকতে থাকতেই বাচ্চারা এই শব্দের সঙ্গে খুব পরিচিত হয়ে যায়। তাই ডিম ফুটে বেরোবার ঠিক আগে মা-মুরগিকে সরিয়ে নিয়ে আবার তিন দিন বাদে যদি বাচ্চার কাছে আনা যায় তাহলে বাচ্চাগুলো মাকে

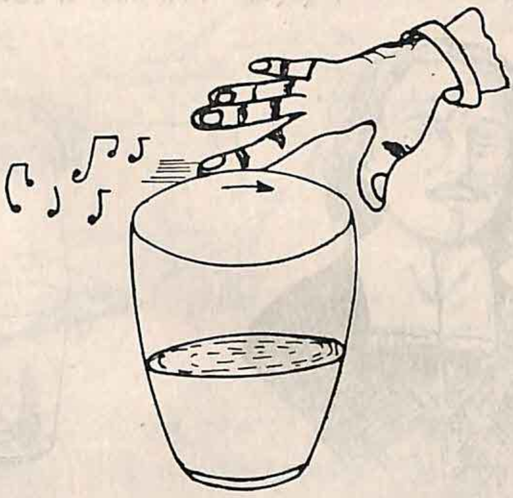


ঠিকই চিনতে পারে। সঙ্গে অন্য মুরগি থাকলেও তারা ভুল করে না। আর একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা দিতে দিতে যদি রেকর্ডে 'বিপ্-বিপ্' শব্দ করা যায় তাহলে যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় তখন আসল মা'কে কাছে আনলেও তারা চিনতে পারে না। উপরন্তু যে রেকর্ড থেকে শব্দটি আসছে তার দিকে এগোতে থাকে অর্থাৎ ঐ রেকর্ডটাকে তারা মা বলে ভাবে। ডিমের ভেতরে থাকার সময় বাচ্চারা শব্দের পার্থক্য কী করে বোঝে তা জানার জন্যে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

———

7. গ্লাস নিয়ে গ্লাসবাজি

আমেরিকান বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন জলভরা গ্লাস নিয়ে একটি সুরেলা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি সেই বাদ্য যন্ত্রটির নাম রেখেছিলেন "আরমোনিকা" (Armonica)। মহাজ্ঞানীর পথ ধরে প্রথমেই আমরা তাই গ্লাসকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে পাতলা কাচের গ্লাস নিলে ভাল হয়। গ্লাসে অর্ধেক মত জল ভর্তি করে



চিত্র—7.1

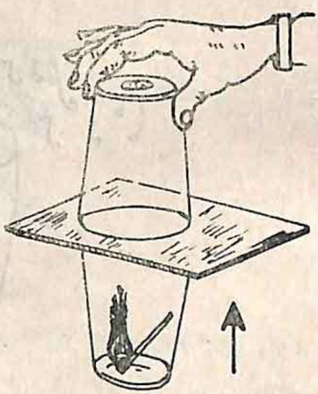
আঙুলটি স্বল্প ভিজিয়ে গ্লাসের কানা বরাবর আঙুলটি কয়েকপাক ঘোরাও (চিত্র 7.1)। কি, সুরেলা আওয়াজ বেরুচ্ছে ? এবার দুটি কাঠি যোগাড় কর। কয়েকটা গ্লাসও নাও। এখন গ্লাসগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ জল নাও। কাঠি দিয়ে জলতরঙ্গের মত এবার বাজাতে শুরু কর। কেমন লাগছে ? গ্লাসগুলিতে জলের মাত্রার বা উচ্চতার হেরফের ঘটাও। শব্দ কেমন পরিবর্তিত হয় দেখ। শুধু জলই বা নেবে কেন ? তেল, মোবিল ইত্যাদি তরল নিয়েও পরীক্ষা করতে পার।

অটো ফন গ্যারিকে (চিত্র 7.2) জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ শহরে বায়ুর চাপ সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা আট-আট মিলে মোট ষোলটি ঘোড়া চালিয়ে সবার সামনে দেখিয়েছিলেন। দুটো ফাঁপা অর্ধগোলককে মাপে মাপে

আটকে তার ভেতরের বাতাস পাম্প করে নিয়ে পরষ্পর বিপরীত দিক থেকে আটটা করে ঘোড়া দিয়ে টানার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। বহু চেষ্টা করেও ঘোড়াগুলি ঐ অর্ধগোলক দুটি টেনে খুলতে পারেনি। সেটা ছিল 1654 সাল। এখন আমরা ঐ একই ধরনের পরীক্ষা দুটি কাচের গ্লাস দিয়ে দেখাতে পারি। এই পরীক্ষাটির জন্য একমাপের দুটি কাচের গ্লাস আর রবারের একটা চওড়া চাকতি জোগাড় কর। যদি রবারের রিং বা চাকতি জোগাড় করতে না পার তাহলে ফাটা বেলুনের একটা বড় টুক্‌রো অথবা নরম বা ভেজা ব্লটিং পেপার



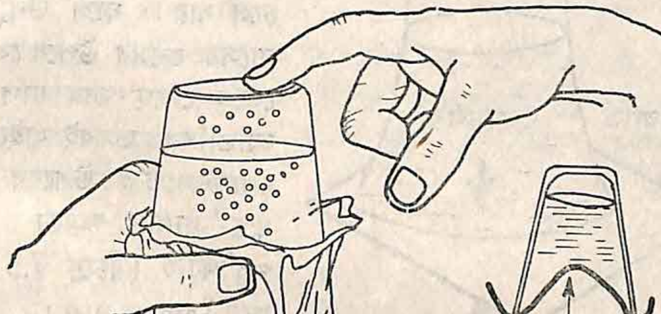
চিত্র—7.2 অটো ফন গ্যারিক (1602—1686)



চিত্র—7.3

জোগাড় করলেও চলবে। এবার একটা কাগজে আগুন ধরাও এবং জ্বলন্ত কাগজটি নিচের গ্লাসে ফেলে দাও। ভেজা ব্লটিং কাগজ বা রবারের রিংটি তলার গ্লাসের মুখের কানা বরাবর লাগাও এবং দ্বিতীয় গ্লাসটিকে উপুড় করে প্রথম গ্লাসটির ঠিক মুখোমুখি চেপে বসাও। কাগজের টুকরোটা পুড়ে ছাই হবার একটু পরেই দেখবে গ্লাস দুটো কেমন শক্ত হয়ে পরস্পরের সংগে এ*ঁটে গেছে (চিত্র 7.3)। অক্সিজেন আগুন জ্বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কিছুটা বাতাস গরম হয়ে আগেই বেরিয়ে যাওয়ার ফলে গ্লাসের ভেতরকার বাতাসের চাপ কমে যায়। তার ফলে বাইরের বাতাসের বাড়তি চাপে গ্লাসদুটি পরস্পরের সঙ্গে এ*ঁটে যায়। যেন এরা এখন জমজ গ্লাস !

ঠাণ্ডাজল কি ফুটতে পারে ?—হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারে যদি তার উপর থেকে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এতসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গভীরে না গিয়েও নির্ভেজাল আনন্দ পাওয়ার জন্য একগ্লাস ঠাণ্ডাজল আর একটা রুমাল নিয়ে 'জল ফুটছে' এটা দেখানো যায়। একটা গ্লাসে 3/4 অংশ জল দাও এবং একটা রুমাল নাও। রুমালটা গ্লাসের মুখে ঢাকা দিয়ে মাঝের দিকটা হাত দিয়ে একটু গর্তমত করে দাও। এবার জলভর্তি গ্লাসটা উপুড় করে দিও। "জল! ফুটতে শুরু



চিত্র - 7.4

করো!"—একরকম আদেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে যদি গ্লাসের পিছনে একটু আঘাত করো তাহলে রুমালটা টানটান হতে থাকে। এর ফলে ভিতরে একটা আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বাইরের বাতাস তখন রুমালের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে। ঠাণ্ডা জলের ভিতর দিয়ে বাইরের বাতাস বুদ্‌বুদ্ আকারে উপরের দিকে উঠে (চিত্র 7.4)। দৃষ্টি তথা মনের ভ্রমে আমরা ভাবি বুঝি ঠাণ্ডা জল ফুটতে শুরু করেছে।

স্কুলের বিজ্ঞান বইতে বায়ুমণ্ডলের চাপ সংক্রান্ত পরীক্ষা বোঝাতে গিয়ে দেখানো হয় একটা জলভর্তি গ্লাসের জল পড়ছে না। সেখানে অনেক বইতেই লেখা আছে জলটা কিন্তু গ্লাসের কানায় কানায় ভর্তি থাকা চাই, তা নাহলে পরীক্ষাটি সফল হবে না। হাতে নাতে পরীক্ষা কিন্তু এর স্বপক্ষে রায় দেয় না। কানায় কানায় ভর্তি না থাকলেও কিন্তু দেখা যাবে জল পোস্টকার্ড ঠেলে বেরুচ্ছে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ বিচারক হল পরীক্ষা। তত্ত্বকে ভুল কিংবা সংশোধন করার জন্য পরীক্ষার ফলই নির্দেশ দেয়। আংশিক ভর্তি অর্থাৎ

কিছুটা গ্লাসে বাতাস থাকা সত্ত্বেও উপুড় করলে কেন পোস্টকার্ডের উপর জল দাঁড়িয়ে থাকে ? তার কারণ হল পোস্টকার্ড দিয়ে মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি গ্লাসটি উপুড় করার সময় গ্লাসের ভিতরের কিছু বাতাস ভিতরের জলের চাপে পোষ্টকার্ড ঠেলে বাইরে চলে যায়। ফলে উপুড় করা গ্লাসের জলের উপরে যে বাতাস থেকে গেছে তার চাপ কম। স্বাভাবিক ভাবেই বাইরের চাপ পোস্টকার্ডের উপরের জলকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। পরীক্ষাটি (চিত্রে 7.5) নিজে করে সিদ্ধান্ত নাও।



চিত্র—7.5

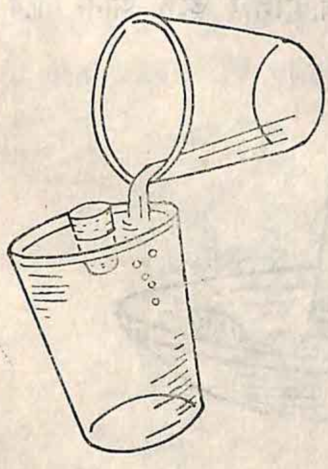
এবার দুটি জলভর্তি গ্লাসের পরীক্ষা করা যাক্। একই ধরনের দুটি গ্লাস জল ভর্তি করে চৌবাচ্চার ভিতর হাত ডুবিয়ে দুটি মুখোমুখি রেখে বাইরে আন। দেখবে জলভর্তি অবস্থায়ই দুটি থাকবে। এগুলোকে একটা বড় গামলার উপর রাখ (চিত্র 7.6)। উপরের গ্লাসটাকে খুব সাবধানে একটু সরাও। বায়ুমণ্ডলের চাপের কারণে জল বেরিয়ে আসবে না। এ অবস্থায় দুটি গ্লাস স্পর্শ না করে কিভাবে উপরের গ্লাসের জল বের করে আনতে পারবে ? একটা শরবৎ খাওয়ার নল বা



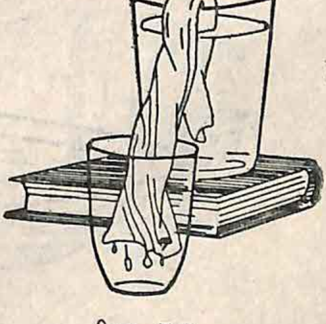
চিত্র—7.6

স্ত্র নাও। এবার ছবির মতো ঐ দুটি গ্লাসের সংযোগস্থলের ফাঁকটুকুতে সজোরে ফুঁ লাগাও। কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বাতাস উপরের গ্লাসে ঢুকে পড়বে। আর তাহলেই কেল্লা ফতে! হুড়্‌মুড়্‌ করে উপরের গ্লাসের জল গামলায় গড়িয়ে পড়বে।

দুটি গ্লাস নিয়ে আর একটি পরীক্ষা করা যাক্‌। একটা গ্লাসে জল ভর্তি করে তার মাঝে একটা কর্ক ভাসাও। দেখবে কর্কটা গ্লাসের মাঝে থাকতে চাইছে না—কানার দিকে বার বার চলে আসছে। কি করলে কর্কটি গ্লাসের জলের ঠিক মাঝ বরাবর থাকবে? এজন্য দ্বিতীয় গ্লাসটিকে কাজে লাগাও। দ্বিতীয় গ্লাসে কিছুটা জল নিয়ে এসে ধীরে ধীরে প্রথম গ্লাসে ঢালতে থাক (চিত্র 7.7)। দেখবে জল প্রথম গ্লাসের কোনা ছাড়িয়ে কিছুটা উঠে গেছে অথচ উপচে পড়ে যাচ্ছে না। ঐ অবস্থায় জল ঢালা বন্ধ কর। এখন প্রথমে গ্লাসের জলতলের আকার হল উত্তল। এ অবস্থায় কর্কটি ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ সর্বোচ্চ উচ্চতার তরল-তলে (উত্তল) গিয়ে অবস্থান করবে।



চিত্র—7.7

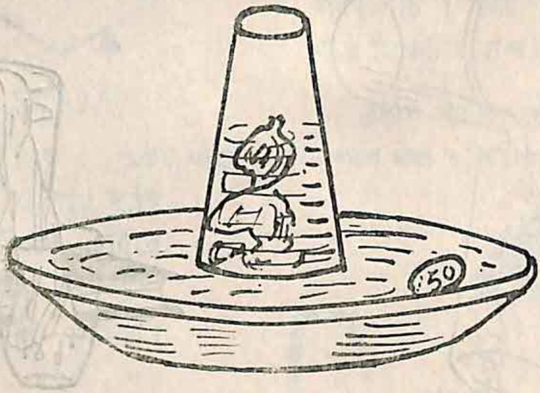


চিত্র—7.8

পরের পরীক্ষাটিতেও দুটি গ্লাস নাও। একটাতে জল রেখে সেটি কিছুটা উঁচুতে রাখ। অন্যটা খালি অবস্থায় নিচে রাখ। একটা পরিষ্কার রুমাল জোগাড় করে জলে ভেজাও। এবার রুমালটির একটা ধার জলভর্তি গ্লাসের তলা পর্যন্ত ডোবাও। রুমালের অন্য ধারটি খালি গ্লাসটাতে রাখ। সন্ধ্যাবেলা এ কাজটি সেরে পরের দিন ঘুম থেকে

উঠে দেখবে উপরের গ্লাসে জল নেই অথচ নিচের গ্লাসে সেইজল এসে জমা হয়েছে (চিত্র 7.8)। রুমালের সূক্ষ্ম সুতো এখানে কৈশিক নলের মত কাজ করে। আর জলের পৃষ্ঠটান ধর্মের কারণে এই ঘটনা ঘটে। ইংরাজীতে একে বলে "ক্যাপিলারি অ্যাকশন" (Capillary action)। এই ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানো যায়। ধরা যাক্, বাড়ীর জলের পাইপ লাইনে একটা ছ্যাঁদা হয়ে টপ্‌টপ্ জল পড়ছে। ছ্যাঁদার নিচে যে বালতি পাতবে সে উপায় হয়ত নেই। এ অবস্থায় পাইপের ছ্যাঁদাতে উলের সুতো কয়েকপাক জড়িয়ে তার অন্যপ্রান্তটা নিয়ে গিয়ে দূরে কোন সুবিধামত জায়গায় একটা বালতির মধ্যে রেখে দাও। আর জলের জায়গা না থাকলে, নর্দমার মুখেও ঝুলিয়ে দিতে পারো সুতোটাকে। ঘরদোর জলময় হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—যতক্ষণ না মিস্ত্রী এসে ছ্যাঁদাটি সারাচ্ছে।

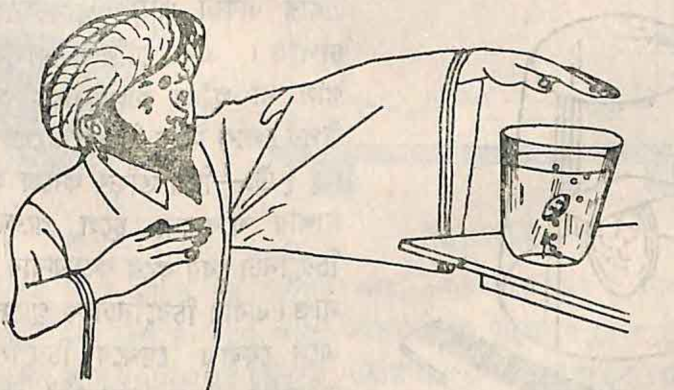
একটা বড়সড় প্লেটের উপর একটা আধুলি রাখা হল। এবার আধুলিটা ডোবার মত প্লেটে জল ঢাল। এখন জলে আঙুল না ডুবিয়ে বা প্লেটের জলটা না ফেলে কিভাবে আধুলিটা তুলে আনা যাবে ?



চিত্র—7.9

—এখানেও সমস্যা সমাধানে একটি খালি গ্লাস আমাদের সাহায্য করবে। এক টুক্‌রো কাগজে আগুন ধরিয়ে সেটি ঐ গ্লাসের মধ্যে ফেলে দাও। একটু পরে জ্বলন্ত কাগজশুদ্ধ গ্লাসটাকে উপুড় করে রেখে দাও আধুলিটার পাশে, প্লেটের উপর। কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই দেখবে—প্লেটের যত জল এক অদৃশ্য টানে গ্লাসের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে (চিত্র-

7.9)। প্লেটের জল গ্লাসের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পর শুকনো আধুলিটা তুলে নিতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হবে না। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল ?—গ্লাসের মধ্যের বাতাস গরম হয়ে হাল্কা হয়ে খানিকটা বেরিয়ে যায়। ঐ অবস্থায় গ্লাসটাকে উপুড় করে প্লেটের উপর রাখলে কিছুক্ষণ পরে গ্লাসের ভিতরের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয় ; চাপ যায় কমে। বাইরের বাতাসের চাপে তখন প্লেটের জল গ্লাসের মধ্যে ঢুকতে থাকবে। এখানে গ্লাস জল টেনে নেয় না ; বাইরের বাতাসই জলকে ঠেলে গ্লাসে ঢোকায়। প্রসঙ্গক্রমে বলি এরকম পরীক্ষায় কাগজে আগুন ধরাতে হবে এমন কোন আবশ্যিক শর্ত এতে নেই। ফুটন্ত জল দিয়ে গ্লাস ধুয়ে পরীক্ষাটি করলে একই ফল দেবে। মোটামুটি ভাবে গ্লাসের ভেতরের বাতাসকে গরম করতে হবে—এটাই হল কথা। সাধারণ একটি পরীক্ষার কথা উত্থাপন করি। ধর তুমি গ্লাসে চা খাচ্ছ। প্রসংগক্রমে এ অবস্থায় কিছুটা চা তুমি সামনের প্লেটে ঢেলে দাও। আর চা খাওয়া শেষ করা মাত্র চায়ের গরম গ্লাসটি উপুড় করে চা-ঢালা প্লেটের উপর চাপিয়ে দাও। মিনিট খানকের মধ্যে দেখবে গ্লাসের মধ্যে প্লেটে থাকা চা উঠে গেছে। কি, চায়ের টেবিলের পরীক্ষাটি ভাল নয় ?—মনে



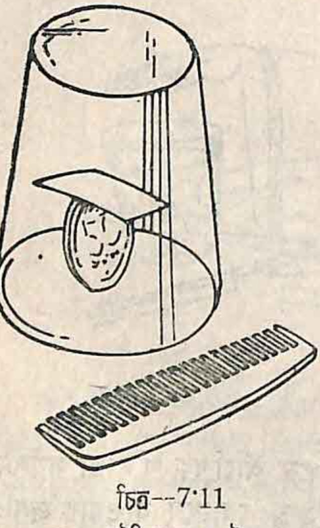
চিত্র—7.10

রেখো, আগের পরীক্ষায় অক্সিজেন পুড়ে গিয়ে আংশিক শূন্যতা সৃষ্টির জন্য জল এতটা উঠেনি ; বাতাস গরম হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যই উঠেছে। চায়ের টেবিলের পরীক্ষাটা এ সত্যটাই প্রতিষ্ঠিত করল।

এবার একটা গ্লাসে ঠাণ্ডা-পানীয় ঢাল। একটা জামার বোতাম

তাতে ফেল। কিছুক্ষণ পর তুমি বলতে পার, "ফুস মন্তর ফুঃ। আয়রে বোতাম, উপরে আয়!" বোতাম তোমার কথামত উপরে উঠল। পরক্ষণেই বললে "এবার নেমো পড়ো!"—বোতাম নামতে শুরু করল। এভাবে তোমার কথামত বোতাম গ্লাসের ঠাণ্ডা পানীয়ের মধ্যে ওঠা-নামা করতে থাকবে (চিত্র-7.10)। কারণটা কিন্তু তোমার আদেশ নয়; কারণটা হল ঠাণ্ডা পানীয়ের কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর বুদ্‌বুদ্‌গুলি বোতামের গায়ে জমা হয়। বেশ কিছু জমা হয়ে গেলে আর্কিমিডিসকে মান্য করে তরলের মধ্যে বোতামটিকে ঠেলে উপরে তোলে। যখন উপরে পেঁছে যায়, তখন অনেকগুলি বুদ্‌বুদ্‌ বাতাসের সংস্পর্শে আসার ফলে ফেটে যায়। এ অবস্থায় বোতাম তার নিজের ওজনে নিচের দিকে নামে। এভাবে চলে ওঠানামার খেলা। ঠাণ্ডা পানীয় না পেলে গ্লাসটি জল দিয়ে ভর্তি কর এবং তাতে কয়েক চামচ ভিনিগার এবং সামান্য সোডা বাইকার্বোনেট ঢেলে দাও। তারপর পরীক্ষাটা যেমন করছিলে তেমনি কর।

প্রঃ—একটা আধুলি খাড়া করে টেবিলের উপর দাঁড় করাও। তার উপর একটা পাতলা কাগজের টুক্‌রো চড়াও (7.11 নং চিত্র)। এবার একটা খালি গ্লাস এর উপর চাপাও। এখন টেবিল না নাড়িয়ে, গ্লাস না ছুঁয়ে কাগজটাকে আধুলির উপর থেকে নিচে কিভাবে ফেলবে?



চিত্র—7·11

[উঃ—স্থির তড়িৎ কাজে লাগাও। মাথার শুক্‌নো চুলে পকেট থেকে চিরুনিটা বের করে কয়েকবার আঁচড়ে নাও। এবার চিরুনিটাকে গ্লাসের কাছে এনে ফেল। দেখবে চিরুনির স্থির তড়িতের টানে কাগজটি টানা হয়ে আধুলির সিংহাসন থেকে টেবিলে নেমে এসেছে।]

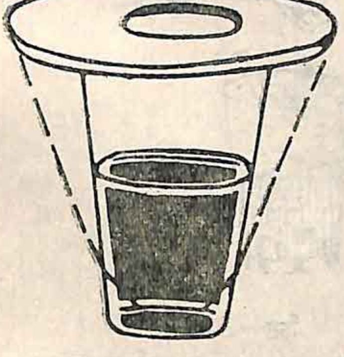
প্রঃ—টেবিলের উপর একটা স্ট্যাম্প আছে। ঐ স্ট্যাম্পটির উপর একটা খালি কাচের গ্লাস চাপাও। এখনও কিন্তু সাইড থেকে স্টাম্পটি

দেখতে পাচ্ছ। কি করলে গ্লাসের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলেও স্ট্যাম্পটিকে দেখতে পাবে না ?

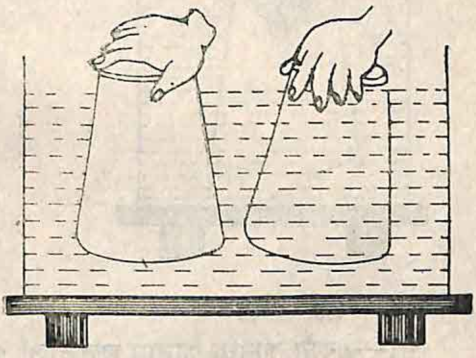
[উঃ—গ্লাসটিতে জল ঢাল। আর মুখে একটা প্লেটে চাপা দাও (চিত্র-7.12)। আলোর প্রতিসরণ ধর্মই এখানে স্ট্যাম্পটিকে অদৃশ্য করছে।]

প্রঃ—এক গ্লাস বাতাস নিয়ে এসো ত ?

[উঃ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়, এক গ্লাস বাতাস ঢেলেই আনা হচ্ছে। এজন্য পরীক্ষাটি সবার সামনে করো। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা জলভর্তি বড়সড় পাত্র কিংবা বাড়ীতে অ্যাকোরিয়াম থাকলে ব্যবহার করতে পার। প্রথমে একটা গ্লাসকে কাত করে অ্যাকোরিয়ামের



চিত্র—7.12

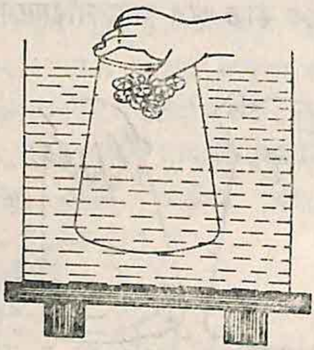


চিত্র—7.13

জলে ডুবিয়ে দাও যাতে তা চট্‌পট্‌ জলে ভর্তি হয়ে যায়। এবারে দ্বিতীয় গ্লাটসাকে উপুড় করে খাড়া নিচের দিকে সজোরে চেপে নিয়ে যাও। এখন অ্যাকোরিয়ামের ভেতরে তোমার এক হাতের গ্লাসে রয়েছে জল, অন্যটায় বাতাস (চিত্র-7.13)। সাবধানে গ্লাস দুটোকে মুখোমুখি নিয়ে এসে এক গ্লাস থেকে অন্য গ্লাসে বাতাস চালান কর। যে গ্লাসে জল ছিল তার ভিতর দিয়ে বড় বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বাতাস যখন ঢুকছে, তখন বাইরে থেকে তা স্পষ্ট দেখা যাবে। মনে হবে এক গ্লাসের বাতাস অন্য গ্লাসে চালান দিয়ে গ্লাসটি ভর্তি করা হচ্ছে। কি ? গ্লাস ভর্তি বাতাস পাওয়া গেল ?

প্রঃ—জলের মধ্যে রুমাল ডুবাবে তবু একটুও ভিজবে না—পারবে কি ?

[উঃ—একটা খালি গ্লাস দরকার। তাহলেই পারব। রুমালটাকে তালগোল পাকিয়ে গ্লাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এবারে এক বালতি জলের মধ্যে গ্লাসটাকে উপুড় করে জোরে জলের মধ্যে ডোবাও (চিত্র-7.14)। এবার তুলে আনো। শুক্‌নো রুমাল যেমন ছিল তেমনিই থাকবে। এখানে গ্লাসের বাইরের অংশটা জলে ডুবে থাকলেও তার ভিতরে আট্‌কে পড়া বাতাসের চাপের দরুন গ্লাসের মধ্যে জল ঢুকতে পারে না ; তাই রুমালও থাকে শুকনো খট্‌খটে।]



চিত্র—7.14



চিত্র—7.15

প্রঃ—একটা কানায় কানায় জলভর্তি গ্লাসে কতগুলো আলপিন ঢালা যাবে ? (দেখো জল যেন উপচে না পড়ে)।

[উঃ—পরীক্ষার দ্বারা উত্তর দেওয়া যাক্‌ (চিত্র-7.15)। একটা মুখফোলা গ্লাস নাও। জল ঢেলে গ্লাসটি কানায় কানায় ভর্তি করো। একে একে খুব সাবধানে পিন ফেলো। মাথাটা ধরে পিনটাকে তুলে তার সরু দিকটা জলে ডোবাও। তারপর সোজা ছেড়ে দাও যাতে জল উপচে না পড়ে। এভাবে পরপর ফেলে যাও নিচে গিয়ে পিন জমা হচ্ছে—একশ, দুশ', চারশ'—তবুও জল উপচে পড়ছে না। দেখতে পাবে জলের তলাটা কিনারার উপরে একটু ফুলে উঠেছে (জলের পৃষ্ঠটান ধর্ম কাজ করে)। আপাতদৃষ্টিতে অবাক লাগলে কি হবে ; মোট পিনের আয়তন আর গ্লাসের মুখের কাছে উত্তলভাবে ফুলে উঠা জলের আয়তন

হিসেব করলে দেখা যাবে—আরও কিছু পিন ঢোকানো যাবে। গ্লাসের মুখটা যত প্রশস্ত হবে ততই তা আরও বেশী পিন গ্রহণ করতে পারবে, কারণ সেক্ষেত্রে ফুটে ওঠা অংশটা হবে আরও বেশী আয়তনের। প্রায় হাজারটা পিন এভাবে ধরিয়ে দেওয়া যায়। চোখে দেখে মনে হয়, পিনগুলো যেন গ্লাসের অনেকটাই দখল করে ফেলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জল উপচে পড়ছে না। বেশ মজার তাই না ?]

———

৪. মহাবিশ্বে-মহাকাশে

'মহাবিশ্ব', 'মহাকাশ' শব্দ দুটি এখন আর কল্পলোকের ভাষা নয়। 1961-র 12 এপ্রিল য়ুরি গ্যাগারিনের মহাকাশে পদ-চারণা, আমাদের কল্পলোক থেকে বাস্তবে নামিয়ে এনেছে। বহু পুরানো কাল্পনিক ধারণা বাতিল হয়েছে, আর সঠিক তত্ত্ব পরীক্ষার কষ্ঠিপাথরে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। মহাকাশ যান, মহাকাশ স্টেশন, কৃত্রিম উপগ্রহ ত এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আন্তর্দেশীয় খবরাখবর, টিভি নেটওয়ার্ক, আবহাওয়া বার্তা, নিম্নচাপের অবস্থান, টর্নেডোর গতিপ্রকৃতি, বনাঞ্চল ও ভূ-প্রকৃতি সার্ভে করা প্রভৃতি নানান কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে আমাদের কাছে একনিষ্ঠ ও অতি প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা। যাইহোক্, মহাকাশে কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহে কোন বস্তুর ওজন কত? মোটামুটি যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরাই বলবেন, "ওসব জায়গায় বস্তুর কোন ওজন থাকে না।"

—"আচ্ছা, বস্তুর ভর রয়েছে অথচ ওজন নেই। এই ওজন না থাকাটা কিংবা ওজনশূন্যতা বোঝা যাবে কি ভাবে?"

—"একটা লিফ্টে করে নিচে নামতে শুরু করার সময়ে যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় মনে আছে তো? নারগদোলায় নামার সময়, কিংবা সুইমিং পুলে খুব উঁচু থেকে ডাইভিং করার সময়, কিংবা প্যারাসুট নিয়ে খোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নামার সময় অস্বাভাবিক ভাবে নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয়। এই অনুভূতিটাই হল ওজন হারানোর অনুভূতি।"

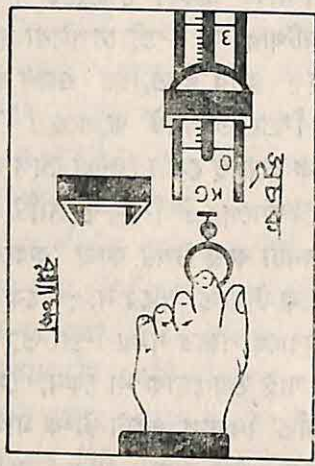
বস্তুর ভর আর ওজনের ব্যাপারে একটু বলে নিই। বস্তুর ভর হল বস্তুটির জড়তার (Inertia) পরিমাপ। ভর বস্তুর একটি অপরিবর্তনীয় ধর্ম এবং সেটি বস্তুর ভেতর থাকা জড়পদার্থ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। সাধারণ তুলাযন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ভরের পরিমাপ করা যায়। অন্যদিকে পৃথিবী যে বল দিয়ে কোন বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাই বস্তুটির ওজন। ওজন হল অভিকর্ষজনিত একটি বল। স্প্রিংতুলায় সাহায্যে বস্তুর ওজন মাপা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন ওজন এবং অভিকর্ষ এক জিনিস

নয়। অভিকর্ষ বস্তুর উপর কাজ করে; আর ওজন হল সেই বল যা বস্তুটি যেখানে ঝোলানো থাকে কিংবা বস্তুটিকে যার উপর রাখা আছে তার উপর ক্রিয়া করে। ধরা যাক্ একটা পেরেকে স্প্রিং-তুলা ঝুলিয়ে তার নিচের হুকে একটা বাটখারা বা বস্তু চাপানো হল। এখানে বস্তুর উপর অভিকর্ষ কাজ করছে; আর বস্তুটির ওজন কাজ করছে ঐ পেরেকটির উপর যেখান থেকে স্প্রিং তুলাটি ঝুলছে। কি, অভিকর্ষ ও ওজনের মধ্যে যে একটা ফারাক রয়েছে সেটা বোঝা গেল ত?

এবার ওজনশূন্যতায় আসা যাক্। আগের ঐ স্প্রিং-তুলাটি যদি পেরেক থেকে হঠাৎ খসে পড়ে, তখন ওজনটা কার উপর কাজ করবে? অর্থাৎ একটা পড়ন্ত বস্তু, স্প্রিং-তুলাকে টানতে পারে না; কেননা সেও ওটার সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে। কাজেই অবাধে পড়ার সময় স্প্রিং-তুলার পাঠ শূন্য। অবাধে পতনশীল বস্তুটির যাই ভর হোক না কেন, সেটি ওজন শূন্যতা অনুভব করবে। জিনিসভর্তি বিশাল একটা ট্রাঙ্ক মাথায় করে কোন চোর যদি চার তলা থেকে ঝাঁপ দেয়—ঝাঁপ দেওয়া কালীন তার মাথার উপর যে একটা ট্রাঙ্ক আছে তা সে বুঝতেই পারবে না। তবে মাটিতে পড়ার অবস্থার কথা এখানে আলোচনা করছি না। মাটিতে পা ঠেকানোর ঠিক আগের মুহূর্তেই থেমে গেলাম। যে পড়ছে সে না হয় ওজনশূন্যতা অনুভব করছে, কিন্তু যে দূর থেকে পড়তে দেখছে সে কিভাবে বুঝবে ওজনশূন্যতা? এখানে পতনশীল ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে স্প্রিং-তুলা লাগিয়ে দিলে দূরে দাঁড়িয়ে তার পাঠ নিলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। ওজনশূন্যতা বিষয়ে এবার একটা পরীক্ষার কথা বলি।

স্প্রিং-তুলার আংটায় একটা ওজন ঝুলাও। ওজন সমেত স্প্রিং-তুলাকে দ্রুত নিচে নামাও। এজন্য একটা পুলি-ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পার। নিচে নামাবার সময় যন্ত্রের কাঁটাটার উপর নজর রাখো। দেখার সুবিধার জন্য খাঁজের মধ্যে ছোট একটা ছিপির টুক্‌রো গুঁজে দিয়ে এটার গতির উপর লক্ষ্য রেখো। যন্ত্রের কাঁটা পুরো ওজন নির্দেশ করতে সক্ষম হবে না। অনেক কম দেখাবে। স্প্রিং-তুলাটা যদি অব্যাহত ভাবে পড়তো এবং সে সময় তুমি যদি তার কাঁটাটার উপর নজর রাখতে পারো তাহলে দেখবে এটা শূন্য ওজন দেখাবে।

এই পরীক্ষাটাকে একটু অন্যভাবে করা যায়। একটা স্প্রিং-তুলার স্কেলের সঙ্গে একটা টিন-প্লেটের ক্ল্যাম্প আটকাও, দেখো যাতে করে ক্ল্যাম্পটি স্কেল ঘেঁষে সচ্ছন্দ-চলাচল করতে পারে। এবার দু'কেজি একটা বাটখারা নিচের হুকে লাগাও। এখন ক্ল্যাম্পটিকে সরিয়ে দু'-কেজি পাঠ দিচ্ছে যেখানে সেই সূচকের অবস্থানের কাছে লাগাও (চিত্র 8.1) এরপর স্প্রি-তুলাটি ধরে হঠাৎ নিচের দিকে সমগ্র ব্যবস্থাটি অবাধে নামাও। নামানোর পর দেখবে ক্ল্যাম্পটি শূন্য দাগেএসে গেছে; অবশ্য সূচকটি আবার দু'-কেজি-পাঠের কাছেই চলে গেছে। অবাধে পড়ার সময় সূচক নিশ্চয়ই শূন্য দাগে এসেছিল—কারণ সূচকটাই ত ঠেলে ক্ল্যাম্পটিকে শূন্যস্হানে নিয়ে গেছে।

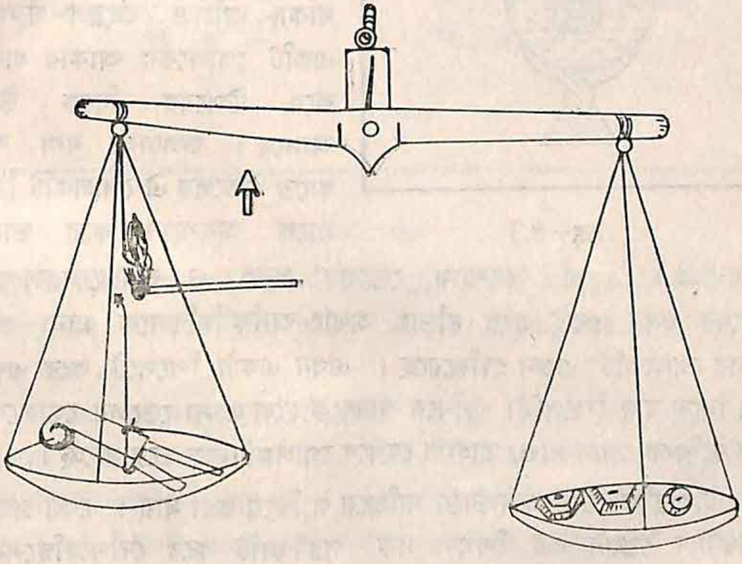


চিত্র—8.1

অবাধে পতনশীল বস্তু ওজন হারায়। এ ব্যাপারে আর একটি পরীক্ষার কথা বলি। একটা দাঁড়ি-পাল্লা, কয়েকটা বাটখারা আর ছোট্ট জাঁতি বা সাঁড়াশি জোগাড় কর। সাঁড়াশির হাতলের একপ্রান্ত সুতো দিয়ে বেঁধে দাও দাঁড়ির এক কোণে। এবারে অন্য পাল্লায় সমান ওজনের বাটখারা চাপিয়ে দাঁড়িপাল্লা ঠিক কর। দু'পাশে সমান ওজন থাকার কারণে পাল্লা দুটি যখন স্হির হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, সে সময় একটা দেশলাই কাঠি জেবলে সাঁড়াশির সঙ্গে টেনে লাগানো দড়িটায় সাবধানে আগুন ধরাও (চিত্র-8·2)। সুতোটা পুড়ে যাবে এবং সাঁড়াশির ঝুলন্ত বাহুটা পাল্লার উপর এসে পড়বে। যেহেতু অবাধে পড়ন্ত বস্তুর কোন ওজন থাকে না, তাই সাময়িক ভাবে সাঁড়াশির ওজন যাবে কমে। এর ফলে সাঁড়াশি চড়ানো পাল্লাটা মুহূর্তের জন্য একটু উপরে উঠে যায়।

জলের আকার কি? এর উত্তরে আমরা বলি—জলের কোন আকার

নেই, যে পাত্রে রাখা হয় জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এটা কিন্তু জলের বা তরলের স্বাভাবিক আকার নয়। যে কোন তরলের স্বাভাবিক আকার হল গোলক-আকার। অভিকর্ষের কারণেই তরল তার নিজের আকৃতি লাভ করতে পারে না। তরলের নিজস্ব ধর্ম হল পৃষ্ঠটান। নিজের অণুগুলির পারস্পারিক আকর্ষণে এই ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই ধর্ম সবসময় চায় তরলকে গোলকের আকারে রাখতে। অন্যদিকে অভিকর্ষ তরলের উপর কাজ করে তাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা আকার করে দিতে চায়।

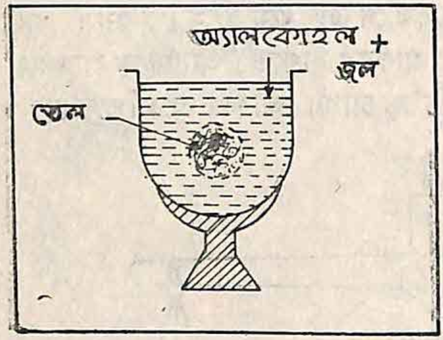


চিত্র—8.2

যদি অভিকর্ষের প্রভাব থেকে তরলকে মুক্ত করা যায়, তাহলে তরল নিশ্চয়ই তার নিজস্ব চেহারা ফিরে পাবে। এজন্য একটা পরীক্ষা করা যাক্। আগে পরীক্ষাটির নীতির কথাটা বলে নেওয়া যাক্। কোন তরল যদি সমান আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বিতীয় তরল দ্বারা আবৃত হয়, তাহলে আর্কিমিডিসের সূত্র অনুসারে প্রথম তরলটি ওজন হারায়, আপাত ভাবে তার কোন ওজন থাকে না। অর্থাৎ তরলটি অভিকর্ষ-মুক্ত বলে ভাবা যায়। আর এই ওজনশূন্য অবস্থায় প্রথম তরলের আকার ধরা পড়বে।

একটা গ্লাসে কয়েক ফোঁটা তেল যেমন অলিভ অয়েল ঢাল এবং তাতে

অ্যালকোহল বেশ কিছুটা ঢাল (প্রায় আধ গ্লাস)। অলিভ ওয়েল জলে ভাসে কিন্তু অ্যালকোহলে ডুবে যায়। তাই এক্ষেত্রে অলিভ অয়েল গ্লাসের তলায় পড়ে থাকবে। এবার ধীরে ধীরে গ্লাসে জল ঢালতে থাক এবং কাঠি দিয়ে নাড়তে থাক, যাতে অ্যালকোহলের সঙ্গে জল ভালভাবে মিশে যায়। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে তলায় পড়ে থাকা অলিভ অয়েল সুন্দর একটি গোলকের আকার ধারণ করে উপরের দিকে উঠে আসছে। জলঢালা বন্ধ কর যাতে তেলের ঐ গোলকটি ঠিক মাঝে অবস্থান করে ভাসে

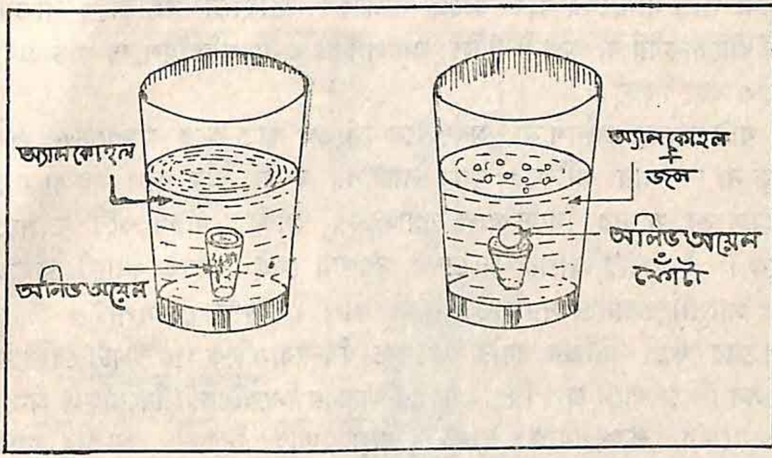


চিত্র—৪.3

(চিত্র-৪.3) । এ অবস্থায় তেলের ঘনত্ব ও অ্যালকোহল-জল মিশ্রণের ঘনত্ব একই হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ আর্কিমিডিসকে মান্য করে তেলের গোলকটি ওজন হারিয়েছে। এখন একটা পিপেটে করে একটু তেল নিয়ে যদি পিপেটটা ডুবিয়ে অ্যালকোহলে ভাসা তেলের গোলকের মধ্যে ঢুকিয়ে ঢেলে দাও, তাহলে দেখবে গোলকটা বড় হয়ে যাচ্ছে।

এই পরীক্ষাটিকে অন্যভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে করা যায়। বেলজিয়াম পদার্থবিদ প্লেটো এই শিক্ষামূলক পরীক্ষাটি করে দেখিয়েছিলেন। একটা ছোট গ্লাসে অলিভ অয়েল ঢেলে, সেটি বড় গ্লাসের মধ্যে বসাও। এরপর ছোট গ্লাসটা চাপা না পড়া পর্যন্ত সতর্কভাবে অ্যালকোহল ঢালতে থাক। এবার একটা চামচে করে অল্প জল ঢালো। জল এমন ভাবে ঢালবে যাতে তা বড় গ্লাসের গা দিয়ে গড়িয়ে নামে। ছোট গ্লাসের ভিতরের তেল ফুলে উঠতে শুরু করবে এবং এক সময় একটা বড়সড় ফোঁটা ভেসে উঠে অ্যালকোহল আর জলের মিশ্রণের মাঝে ঝুলে থাকবে (চিত্র-৪.4)। অ্যালকোহল না পেলে অ্যানিলিন ব্যবহার করতে পার। অ্যানিলিন ঘরের উষ্ণতায় জলের থেকে ভারী কিন্তু 75-85°C উষ্ণতায় জলের থেকে হাল্‌কা। ঘরের উষ্ণতায় নুনগোলা জলের মধ্যে একটি অ্যানিলিন ফোঁটাকে ঝুলিয়ে রাখা যায়। নুনগোলা

জলে লালরঙা তরল অর্থোটলুইডিনের ফোঁটাকেও ঝুলিয়ে রাখতে পারো। চিত্তাকর্ষক হবে যদি তুমি উষ্ণতা পরিবর্তন করে



চিত্র—8.4

অর্থাৎ জলকে গরম করে অ্যানিলিনকে তার মধ্যে সাঁতার কাটাতে এবং বড় ফোঁটার আকার দিতে পার; আবার ঠাণ্ডা করে ভ্যানিশ করে দিতে পার।

এতক্ষণ ওজনশূন্যতায় তরলের আকার কেমন হবে তার কথা বললাম। কারণ মহাশূন্যে বা কৃত্রিম উপগ্রহে কিংবা স্পেশ স্টেশনে ওজনশূন্যতা একটি বিশেষ ধর্ম। পিচঢালা অন্ধকার, উজ্জ্বল সূর্য আর ভারহীনতা নিয়েই ওখানকার জগৎ। ওখানে জিনিসপত্র ভারহীন এবং যেখানে আছে সেখানেই থাকে বা ভাসে। সেখানে জিনিসপত্রকে যে কোন জায়গাতেই রাখা হোক তাদের সাম্য বজায় থাকে। তাই মহাকাশযানের মধ্যে মহাকাশযাত্রীরা চলে না, সাঁতার দেয় বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা ভাল, বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাকাশে ওজনশূন্যতায় ধাতুগলনের কাজ, ঝালাই-এর কাজ ইত্যাদি করলে নতুন নতুন ধাতব দ্রব্য, অর্ধপরিবাহী ইত্যাদি পাওয়া যাবে। মহাকাশে নতুন দ্রব্যাদি প্রস্তুতির সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। যেমন, ইস্পাত থেকে ফেনোস্পাত তৈরি হয়েছে। এই ফেনোস্পাত দেখতে ফেনার মত। নতুন এই দ্রব্যটিতে রয়েছে 90 শতাংশ গ্যাস আর 10 শতাংশ সাধারণ ইস্পাত।

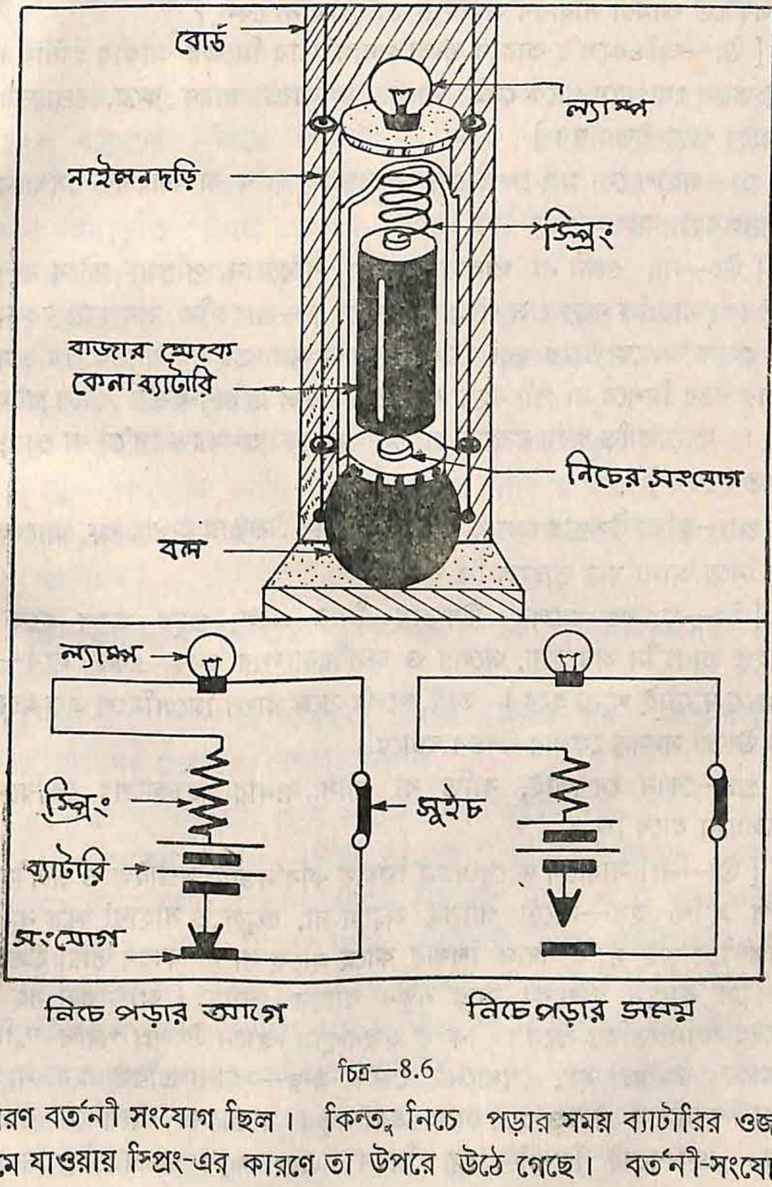
ফেনোস্পাত জলে ডুবে যাবে না, ভাসবে এবং সাধারণ ইস্পাতের মত হবে মজবুত। নতুন নমুনার বিমান, গাড়ি ও মহাকাশযান গড়তে ফেনোস্পাত মানুষের খুব কাজে লাগবে। তাছাড়া মহাকাশে পাওয়া যায় আলোকীয় বা অপ্‌টিক্যাল যন্ত্রপাতির জন্য অতিবিশুদ্ধ কাচ এবং আরও বহু কিছু।

যাই হোক্‌ ওজনশূন্য অবস্থানে বোতল কাত করে ফেললেও জল পড়ে না। আর ঝাঁকিয়ে ঘন সিরাপের মতো যদি জল ফেলা যায় তাহলে তা সুন্দর নির্ভেজাল গোলকের আকার ধারণ করে ভাসতে থাকে। কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার দরকার নেই। মহাকাশযাত্রী ক্লিমুক এবং স্যাভাস্তিয়ানভ স্যালিউট-4 মহাকাশ স্টেশনে হোসপাইপ খুলে জল বের করে টিভির পর্দার মারফত বিশ্ববাসীকে পরীক্ষাটা দেখিয়েছিলেন। সেখানে জল বিরাট বলের আকার নিয়েই ধরা দিয়েছিল অর্থাৎ অভিকর্ষের শৃঙ্খলমুক্ত হয়েই জল তার নিজের আকার লাভ করেছিল।

অভিকর্ষের সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশের সুদূর পাড়ে মহাকাশ যানে ত্বরণশূন্যতা ওজনশূন্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে মহাকাশযানের বেগ স্থির থাকলে বস্তুর কোন ওজন থাকে না। নির্দেশ তন্ত্রের অবাধ পতনের ক্ষেত্রেও একই জিনিস পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় অভিজ্ঞতার জন্য অভিকর্ষের সীমা পেরোনোর দরকার নেই। ইঞ্জিন বন্ধ করা অবস্থায় গ্রহ রাজ্যের বাইরে কোন মহাকাশযানের অভ্যন্তরেই বস্তুর ওজন পাওয়া যাবে না। অবাধপতনের সময়ও বস্তুর ওজন সম্পূর্ণ শূন্য হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ অবাধে পতনশীল বস্তুর একটি উদাহরণ। এখানে অভিকর্ষের অধীনেই উপগ্রহ অবাধে পড়ে কিন্তু বেগের কারণে পৃথিবীর শরীর ছুঁতে পারে না। অঙ্কের ভাষায় বলা যায়—উপগ্রহ হল অবাধে পতনশীল একটি বস্তু যার পতন কাল অসীম। তাই কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তরে সবই ওজনশূন্য।

পরিশেষে আলোর সংকেতযুক্ত একটি ওজনশূন্যতার পরীক্ষাগার পরীক্ষার কথা বলি। ৪.6 নং ছবি দেখলে ব্যাপারটি বুঝতে পারবে। এখানে বাজার থেকে কেনা ব্যাটারির একটা খাপ জোগাড় কর। ব্যাটারির উপরের মাথায় একটা স্প্রিং ঝাল দিয়ে লাগাও (স্প্রিং-টি

ঠিকমত নাহলে কিন্তু কাজ করবে না)। সমগ্র ব্যবস্থাটি একটা নাইনলের দড়ি দিয়ে ঠিকমত ঝোলাও। এবার নাইনলের দড়ি হঠাৎ ছেড়ে দেবে। দেখবে ছাড়ার আগে বাল্ব বা ল্যাম্পটি জ্বলছিল



চিত্র—8.6

কারণ বর্তনী সংযোগ ছিল। কিন্তু নিচে পড়ার সময় ব্যাটারির ওজন কমে যাওয়ায় স্প্রিং-এর কারণে তা উপরে উঠে গেছে। বর্তনী-সংযোগ

ছিন্ন হয়ে গেছে। তার বাল্‌বটিও জ্বলছে না। পরীক্ষাটি করার জন্য একটু প্রযুক্তিগত মুন্সিয়ানা থাকা দরকার।

প্রঃ—তরলের স্বাভাবিক আকার যদি বলের মতো হয়, তাহলে পৃথিবীতে আমরা সাধারণ অবস্থায় তা দেখি না কেন ?

[উঃ—অভিকর্ষের কারণে তরল পদার্থ তার নিজের আকার হারায়। তাই তরল যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকারই ধারণ করে, স্রোতের আকারে পড়ে ইত্যাদি।]

প্রঃ—মহাশূন্যে জল ফোটানো কি সম্ভব ? কিংবা বলা যায় সেখানে কি রান্নবান্না করা যাবে ?

[উঃ—না, ওজন না থাকার কারণে পরিচলন প্রক্রিয়া ঘটবে না। যদি বলা যায় কি করে জল গরম করা যাবে ?—ভারহীন অবস্থায় কোন দিক থেকে জলকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে সে প্রশ্ন অবান্তর। পাত্রের বিভিন্ন জলের স্তর মিশবে না পরিবহণ পদ্ধতিতে জল ভীষণ ধীরে ধীরে গরম হবে। তাড়াতাড়ি গরম করতে চাইলে জলকে অনবরত ঘেঁটে বা নেড়ে চলতে হবে।]

প্রঃ—কৃত্রিম উপগ্রহে জলকে ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় অর্থাৎ স্ফুটনাঙ্কে যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে কি ঘটবে ?

[উঃ—ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় নিয়ে এলে, প্রচুর বাষ্প হবে। যেহেতু ভারহীন অবস্থায়, জলের ও জলীয়বাষ্পের ঘনত্ব একই হবে—এক্ষেত্রে দুটোই শূন্য হবে। তাই জলের সঙ্গে বাষ্প মিলেমিশে এক হয়ে এক উদ্ভট সমসত্ত্ব ফেনার উদ্ভব ঘটাবে।

প্রঃ—কোন দেশলাই, বাতি বা গ্যাস বার্নার মহাকাশের কেবিনে জ্বালানো যাবে কি ?

[উঃ—না। সাধারণ ভাবে দহন ক্রিয়ায় কার্বনডাই-অক্সাইড ও জলীয়-বাষ্প সৃষ্টি হয়—দুটো গ্যাসই জ্বলে না, জ্বলতে সাহায্য করে না। পৃথিবীতে এই দুটি পদার্থ শিখার কাছে থাকে না। কারণ তারা উত্তপ্ত এবং সে কারণে হাল্‌কা আর নতুন বায়ুর প্রবাহ (অক্সিজেন সহ) তাদের স্থানান্তরিত করে। কিন্তু ওজনশূন্য স্থানে উৎপন্ন পদার্থ দুটি যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানেই থেকে যায়—স্থানান্তরিত হয় না। তারা শিখাটিকে ঘেরাও করে রাখে এবং নতুন বাতাসের আগমনে বাধা দেয়। একারণেই শিখাটি হয় বিবর্ণ এবং খুব তাড়াতাড়ি নিভে

যায়। তাই বলা হয় অভিকর্ষ না থাকলে দমকলবাহিনীর দরকার হত না। মহাকাশের কেবিনে যদি শিখার উপর ফুঁ দিয়ে নিরন্তর অগ্নিনির্বাপক গ্যাস দু'টিকে সরিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে শিখাটিকে জ্বালানো সম্ভব হবে।]

প্রঃ—মহাশূন্যে যদি কোন রকেট 9·8 মি/সে^{2} ত্বরণ নিয়ে ছুটে চলে, তাহলে রকেটের ভিতরে অভিযাত্রীর কাছে ওজন সাপেক্ষে কেমন অনুভূতি হবে? যদি মহাশূন্যে রকেট সমবেগে চলে তাহলেই বা কেমন অনুভূতি পাওয়া যাবে? রকেট যদি ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ থাকে তাহলেই বা কেমন হবে?]

[উঃ—প্রথমক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীতে স্থির অবস্থায় যেমন অনুভূতি পাই, তেমনই অনুভূতি মহাকাশচারীর কাছে মনে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে ওজনশূন্যতা অনুভূত হবে।]

প্রঃ—ভারহীন অবস্থায় পেণ্ডুলামে অবস্থা কেমন দাঁড়ায়?

[উঃ—পেণ্ডুলাম ববটি স্থির অবস্হায় দাঁড়িয়ে থাকবে কিংবা বলা যায় যেন আটকে গেছে। দোলন ঘটবে না। অঙ্কের কথায় দোলন-কাল অসীম।]

প্রঃ—ভারশূন্য অবস্হায় মহাকাশযানে কি আর্কিমিডিসের নীতি প্রযোজ্য?

[উঃ—না, ভারহীন অবস্হায় প্লবতা হারিয়ে যায়। এ অবস্হায় আর্কিমিডিসের প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না।]

প্রঃ—কোন্ ভারতীয় প্রথম মহাকাশচারণা করেন?

[উঃ—রাকেশ শর্মা। 1984 সালের 3 এপ্রিল রাশিয়ার রকেটে বাইকোনুর মহাকাশ বিমান বন্দরে মহাকাশ যাত্রা শুরু করেছিলেন রাকেশ শর্মা। সঙ্গে ছিলেন নভো-অভিযাত্রী ইউরি মালিশেভ্ এবং গেন্নাদি স্ত্রেকালভ্। ঐ পরিক্রমায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ছিল খনিজ সম্পদের মানচিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের ক্যামেরার সাহায্যে ভারতের রাজ্যসীমার চিত্রগ্রহণ। আর ভারহীন অবস্হায় যোগব্যায়ামচর্চা দেহমন ভালো রাখার পক্ষে কতদূর কার্যকর সে বিষয়েও এই পরিক্রমায় অনুসন্ধান করা হয়।]

প্রঃ—পৃথিবী থেকে দেখা চাঁদ বেশী উজ্জ্বল, না চাঁদ থেকে দেখা পৃথিবী ?

[উঃ—আপাত ভাবে বংশানুক্রমে পাওয়া ধারণা যাই হোক না কেন, সত্যিকারের পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার হল—চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখলে পৃথিবীকে গাড়ির হেডলাইটের মত উজ্জ্বল দেখায়। চাঁদের উজ্জ্বলতার প্রায় চারগুণ বেশী উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা দেয় আমাদের পৃথিবী। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিফলন-ক্ষেত্রফল প্রায় পূর্ণচন্দ্রের তেরো গুণ। অন্যদিকে চাঁদের প্রতিফলন ক্ষমতা মাত্র 0·07 ; অর্থাৎ সূর্যের আলো যে পরিমাণ চাঁদে এসে পড়ে, তার 93 ভাগ চাঁদ নিজেই শোষণ করে নেয়। মাত্র 7 শতাংশ প্রতিভলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে। তাতেই পূর্ণিমার চাঁদ এত মোহময়। আর আমাদের পৃথিবীর প্রতিফলন ক্ষমতা হল 0·28 ; তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় চাঁদ থেকে দেখা আমাদের পৃথিবীই সূর্যের আলোয় অধিকতর ভাস্বর।]

জেনে রেখো ঃ

বিভিন্ন মহাকাশযাত্রীর কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে যা পাওয়া গেছে, তা প্রশ্নোত্তরের আকারে সাজিয়ে দিলাম ঃ

প্রঃ—মহাশূন্যে কি খাওয়া-দাওয়ার স্বাদ পাওয়া যায় ?

[উঃ—শূন্য অভিকর্ষে খাবারের স্বাদ-গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা মহাকাশচারীরা হারিয়ে ফেলেন। মনে করা হয়, পরিচলন-প্রবাহ নাকের থেকে গন্ধ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।]

প্রঃ—কি করে মহাকাশচারীরা দাড়ি কামায় ?

[উঃ—মহাকাশে তড়িৎ-ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামানো একটি সমস্যা। এখানে কেটে ফেলা দাড়ির অংশ বা চুলের গুঁড়োগুলি মুখের কাছে বিরাট এক সমস্যার সৃষ্টি করে।]

প্রঃ—শূন্যে কোন্ দিক নিচু ?

[উঃ—মহাশূন্যে উঁচু-নিচু কথাটির কোন অর্থ নেই। তবে মহাকাশচারীরা তাঁদের পায়ের দিকটাকে "নিচু" এবং মথার দিকটাকে "উঁচু" হিসাবে অনুভূতির মাধ্যমে মনে করেন।]

প্রঃ—মহাশূন্যে ঘুমানোর অনুভূতি কেমন ?

[উঃ—মহাকাশে ক্ষণিক-ঘুম এবং ক্ষণিক-জাগা নিয়ে চলতে হয়।

এর জন্য তেমন অসুবিধা হয় না। তবে ওজনশূন্যতার কারণে, ভেসে থাকা হাত-পা বাধ্য থাকে না। পাশ ফিরে শোয়া, বা যাদের নাকডাকা, হাত-পা ছোঁড়ার অভ্যাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কমিক বা কার্টুন চিত্রের মতই হাস্যকর সব দৃশ্যের অবতারণা ঘটবে।]

প্রঃ—মহাকাশ যাত্রার মাঝে কোন মহাকাশচারীর মৃত্যু ঘটলে কি করা উচিত?

[উঃ—সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দাও—এটাই ছিল একটা মত। কিন্তু মহাকাশচারীরা এতে সায় দেননি। তাঁরা বলেছেন, হিমশীতলতায় এবং বায়ুশূন্যতার মাঝে মৃত মহাকাশচারীর দেহ সংরক্ষণ করে পৃথিবীতেই ফিরিয়ে আনতে হবে।]

প্রঃ—মহাকাশে বা মহাকাশ স্টেশনে অবস্থানরত মহাকাশচারী মানসিক ভাবে কি চান?

[উঃ—এ প্রসঙ্গে ওদের একজনের উক্তিই তুলে ধরছি ঃ "One astronaut suggested slippers for off-duty wear ; the life in space should be as normal as possible. If a guy wants to have a glass of wine with dinner……he ought to be entitled to do so. He's not flying an airliner—it's home !"]

———

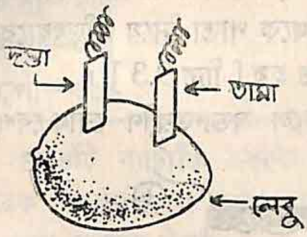
৭. তড়িতের উৎস কোষের সন্ধানে

আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে সভ্যতার সূচনা হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় শক্তির চাহিদা। একে একে চলে শক্তির উৎস-সন্ধান। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে বায়ু, জল সূর্যশক্তি এ সবই শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে মানুষ আজ যান্ত্রিক সভ্যতার প্রায় শিখরদেশে। বর্তমানে তড়িৎ শক্তিই সভ্যতার হৃৎস্পন্দন। ভোল্টা, ফ্যারাডের আবিষ্কারে যার সূচনা; অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও উপগ্রহ যোগাযোগ লেজার রশ্মি যার মাধ্যমে পরিণত, অন্তিম বা উপসংহার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা শক্ত।

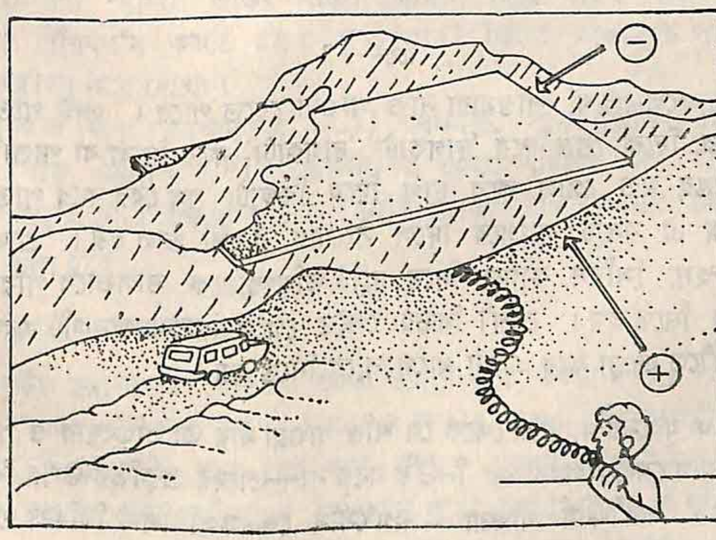
রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করার যন্ত্র হল 'কোষ'। অনেকগুলি কোষের সমন্বয়কে ব্যাট্যারি বলে। ব্যাটারি দিয়ে যন্ত্র চালানোর ব্যাপারটাও বেশ কয়েক দশকের পুরানো। টর্চ বা রেডিওতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, তার মাথা অর্থাৎ কার্বন দণ্ডের মাথা ধনাত্মক বা পজিটিভ মেরু আর তলা অর্থাৎ নিচের ধাতুটি (দস্তার পাতলা পাত) ঋণাত্মক বা নেগেটিভ মেরুর কাজ করে। ভোল্টীয় কোষ, ড্যানিয়েল কোষ ইত্যাদির পাঠ স্কুলের ভৌত বিজ্ঞান দিয়ে শুরু করা হয়েছে। প্রতি কোষে থাকে দুটি ভিন্ন-ধর্মী তড়িৎ-দ্বার আর থাকে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ। পরিভাষাগুলির ব্যবহার বলে দিচ্ছে কোষের শক্তির উৎসের মূলনীতি তড়িৎ-বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত। এখন আমরা কোন একটি তালিকা দ্বারা পাঠ্যবস্তুতে থাকা মৌল ও গৌণ কোষগুলির ছবি ও রাসায়নিক বিক্রিয়া, ক্ষমতা ও তড়িৎচালক বল উল্লেখ করতে পারি। এখন কয়েকটি পরীক্ষা দেখানোর ব্যবস্থা করা যাক। প্রথম পরীক্ষাটির জন্য লাগবে দস্তা ও তামার দুটি পাত আর একটি লেবু; দ্বিতীয়টির জন্য লাগবে ঐ দস্তা ও তামার দুটি পাত আর গাছের পাতা (পাথরকুচি জাতীয় পাতা হলে ভাল হয়)। আর তৃতীয়টির জন্য ঐ পাতাগুলি ছাড়া লাগবে কাঁচা গোবর। প্রতি ক্ষেত্রে লাগবে একটা করে মিলি ভোল্টমিটার আর কিছু সংযোগকারী তার। এবার পরীক্ষায় আসা যাক্।

[এক] লেবু কোষ (Lemon Cell)

টর্চে বা রেডিওতে ব্যবহার করার পর খারাপ ব্যাটারি থেকে কিছুটা দস্তার পাত বের করে নেওয়া যায়। অন্য দিকে পাতলা কিছুটা তামার পাত জোগাড় করে দুটি পাতের সঙ্গে কিছুটা করে লম্বা তার গোল করে ঝাল দিয়ে নিতে হবে। পাতিলেবু (বা টক লেবু) একটা জোগাড় করে বেশ কয়েকবার দোলাই মালাই করে দুটি ধাতুর পাতকে লেবুর ছালের উপর রেখে চাপ দিয়ে লেবুর মধ্যে ঢোকানো হল। খেয়াল রাখতে হবে যেন দুটো গায়ে গায়ে না লেগে যায়। এবার বেরিয়ে থাকা দুটি তারের সঙ্গে মিলি বা মাইক্রো ভোল্টমিটার চাবিসহ লাগানো হল। এবার চাবিটা লাগালে কত বিভব পাওয়া গেল তা জানা যাবে। ছবিটা দেখে নিলে বর্তনী ধারণাটা স্পষ্ট হবে [চিত্র 9.1] লেবুর জায়গায় আলু দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতো কি হয়।



চিত্র—9.1



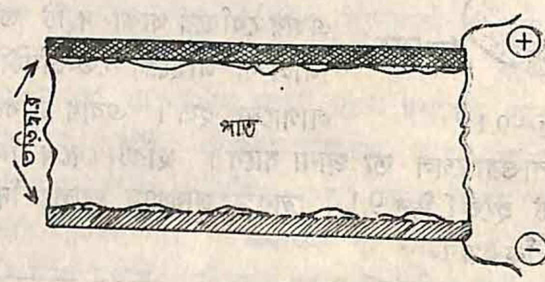
চিত্র—9.2

[দুই] গাছের পাতার জৈব ব্যাটারি (চিত্র-9.2)

বর্তমানে নগণ্য খরচে, সহজলভ্য জিনিসে, পরিচ্ছন্ন গাছের ব্যাটারি তৈরি করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত তড়িৎদ্বারগুলি অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মত ক্ষয় পায় না। এই জৈব তড়িচ্চালক উৎসটিতে কেবলমাত্র দুদিন অন্তর গাছের পাতা পরিবর্তন করলেই চলে।

কেমন করে তৈরি করা যায়? দুটি ভিন্ন ধাতুর তড়িৎদ্বার নিতে হবে। ধাতুটি কত পাতলা বা মোটা নেওয়া হল তার উপর কার্যকারিতা ততটা ইতর বিশেষ হয় না। কোন গাছ থেকে পাতা নিয়ে তড়িৎদ্বারের আকারে কেটে দুটি তড়িৎদ্বারের মধ্যে রাখতে হয় [চিত্র 9.3]।

পাতা ও তড়িৎদ্বারের মধ্যে বায়ু থাকলে অভ্যন্তরীণ রোধ বেশী



চিত্র—9.3

হয়, ফলে পূর্ণ শক্তিমাত্রা নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই পাতাটির উভয় দিকে ব্লেড দিয়ে 'দাগকাটা' 'দাগকাটা' করে দিলে বা পাতাটিকে চোঙের মত গোল করে চাপ দিয়ে কিছুটা রস বের করে পাতাটির গায়ে ঐ রসটি লাগিয়ে দিলে সংযোগ ব্যবস্থা ভাল হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সিরিস কাগজ দিয়ে দুটি তড়িৎদ্বারকে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। বেশী বিভব পেতে গেলে এরকম কয়েকটি একককে শ্রেণীতে জড়ো করে একটা খাপে পুরে নিতে হয়।

এ ধরনের ব্যাটারি থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা তড়িৎদ্বার ও পাতার সংযোগ ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না—তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। পরীক্ষায় পাওয়া 2 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বিভিন্ন তড়িৎ-দ্বারযুগ্মের ক্ষেত্রে কেমন ক্ষমতা পাওয়া যায় তা নিচে সারণীর আকরে দেওয়া হল ঃ

তড়িৎদ্বার যুগ্ম	বিভব মিলিভোল্ট	প্রবাহমাত্রা মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার
কাঁসা—অ্যালুমিনিয়াম	510	320
তামা—অ্যালুমিনিয়াম	535	140
রুপা—অ্যালুমিনিয়াম	510	350
কাঁসা—দস্তা	830	720
তামা—দস্তা	830	740
রুপা—দস্তা	850	890

প্রতিটি ব্যাটারি এককে অভ্যন্তরীণ রোধ কয়েকশ' ওহম থেকে কয়েক কিলোওহ্ম হতে পারে। এটি নির্ভর করে পাতার অবস্থা ও সংযোগ ব্যবস্থার উপর।

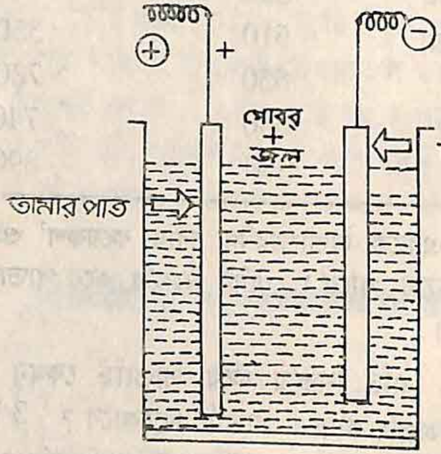
কত দিন চলে? এটি নির্ভর করে পাতাটি কেমন মোটা ও শাঁসালো তার উপর—অর্থাৎ কদিনে পাতাটি শুকোবে? 3 মিমি মোটা মাদার-ইন-লজ টাংগ (Sanse Vieria trifasciata) পাতা প্রায় 10 ঘণ্টা সামনে তড়িৎ শক্তির যোগান দিয়ে যায়। এর পর পাতাটি পরিবর্তন করতে হয়। ঘৃতকুমারী কিংবা পাথরকুচি পাতা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো।

ব্যবহার কি? কমক্ষমতার LCD গণকযন্ত্র, পকেট ভিডিও গেম, LCD ঘড়ি এমনকি LED জ্বালানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। LED জ্বালানোর ক্ষেত্রে দুটি বা তিনটি কোষকে শ্রেণী সমবায়ে যোগ করলে ভাল হবে।

[তিন] গোবর কোষ

একটা হরলিক্সের বোতল, একটা তামার পাত, একটা দস্তার পাত, কিছুটা তার জোগাড় কর। তামা ও দস্তার পাতের সঙ্গে ঝাল দিয়ে বাইরের দিকে দুটি তার বের করে নাও। গোয়াল থেকে কিছুটা গোবর সংগ্রহ করে হরলিক্সের শিশিতে পুরে জল ঢেলে গুলে দাও। এবার তামা ও দস্তার পাতাদুটি ডোবাও। ব্যাস—গোবর কোষ তৈরী। (চিত্র-9.4)

ভোল্টমিটার দিয়ে দেখলে প্রায় 0·6 ভোল্ট মত বিভব প্রভেদ ধরা পড়বে। শ্রেণীতে এরকম পরপর কোষ জড় করলেই ব্যাটারি পাওয়া যায় এবং বিভব প্রভেদও বেশী পাওয়া যায়। এরকম ব্যাটারি তৈরি করে বাড়ীতে রেডিও চালানো যায়।



চিত্র—9.4

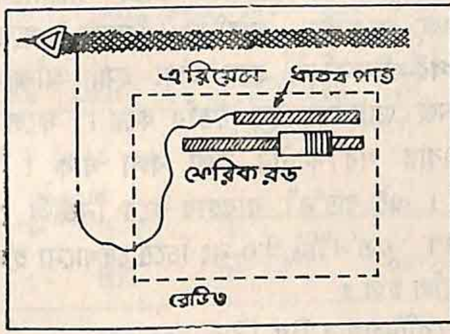
কোষের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পাতগুলির ক্ষেত্রাংশ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের আয়তন বাড়নো দরকার। 4/5 দিন পর পর গোবর ফেলে দিয়ে নতুন গোবর দিতে হয়।

প্রাসঙ্গিক সংযোগ

কোষ বা তৈরি ব্যাটারি দিয়ে রেডিও চালানো সহজ ব্যাপার। কিন্তু দেখা গেল মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি জায়গায় কলকাতা কেন্দ্র ভালভাবে শোনাই যাচ্ছে না। অর্থাৎ বেতার প্রেরক কেন্দ্র থেকে যেসব শ্রোতা বহু দূরে থাকেন তাঁরা অনুষ্ঠান ভালভাবে শুনতে পান না। এক্ষেত্রে কি করা যায়? নিচের পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে দেখো।

একটা দশ/বারো সেণ্টিমিটার লম্বা সামন্য মোটা ধাতুর (লোহা, তামা বা অ্যালুমিনিয়াম) পাত নাও। রেডিওর ভিতরে একটা শক্ত কালো রড দেখতে পাবে—যার নাম ফেরিক রড। এর একপাশে কাগজের চোঙে একটা তারের কুণ্ডলী থাকে। এই রড ও তার

কুণ্ডলীর এক সেণ্টিমিটার দূরে ঐ পাতটি ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দাও। এবার পাতের সঙ্গে তার দিয়ে রেডিও বাক্সে একটা 'পয়েণ্ট' করে, আকাশ তার বা এরিয়ালের সঙ্গে যোগ কর। শুনে বুঝবে দুর্বল



চিত্র—9.5

কেন্দ্রগুলি বেশ স্পষ্টভাবে কানে ধরা দিচ্ছে। এই আকাশ তার ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকরী (চিত্র-9.5)।

তড়িতের উৎস বা ব্যাটারি বা কোষের ব্যাপারে পরীক্ষা সংক্রান্ত কথা বলার খেই ধরে বাজারে যে টর্চ বা ব্যাটারি পাওয়া যায় তার কথা বলা যাক। দোকানে পাওয়া ব্যাটারি হল নির্জল কোষ বা ড্রাই সেল। এই কোষগুলি হল প্রাথমিক কোষ। এদের তড়িচ্চালক বল 1·5 ভোল্ট। এই কোষ কি দিয়ে গড়া ?

প্রথমেই বলা ভাল, কোষটির নাম নির্জল হলেও এটি আদৌ নির্জল নয়। এই কোষে দস্তার চোঙটি ক্যাথোড হিসাবে আর পিতলের টুপিযুক্ত কার্বনদণ্ড অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দুয়ের মাঝখানের শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয় ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কার্বনগুঁড়ো ও জল দিয়ে তৈরি লেই দিয়ে। উপরের দিকটা পীচ দিয়ে সীল করে দেওয়া হয়। সাধারণত ব্যাটারি খারাপ হয়ে গেলে ফেলে দিই। কিন্তু না ফেলে আবার নবীকরণ করে কিছুদিন চালানো যায়।

কোষটি কাজ করার সময় তার ভিতরে কি ঘটনা ঘটে ? তড়িৎ সরবরাহের সময় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড অক্সিজেন ত্যাগ করে। দস্তা অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে জিংক্ অক্সাইডে পরিণত হয়। তাই

প্নরোনো নির্জল কোষের দস্তার চোঙটি সছিদ্র হয়ে উঠতে দেখা যায়। যদি দাস্তার চোঙটি ছিদ্র না হয়ে থাকে তাহলে তাকে চার্জিং বা নবীকরণ করা যায়। এই চার্জিং করার ম্নল পদ্ধতি অনেকটা তড়িৎ প্রলেপনের মত। এতে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে তড়িৎপ্রবাহ চালনার ফলে জিংক্ অক্সাইড আয়নিত জিংক্ ম্নক্ত করে, যা দস্তার চোঙের উপর নিস্তড়িৎ হয়ে জমা হয়, অক্সিজেন আয়নও একইভাবে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। ফলে কোষটি প্ননঃ কার্যক্ষম হয়। এবার পরীক্ষাটার কথা বলা যাক্। এটি একটি ইলেকট্রনিক বর্তনী। এই বর্তনী ব্যবহার করে নির্জল কোষ আংশিক নবীকরণ করা যায়। বর্তনীটি 9·6 নং চিত্রে দেখানো হল।

চিত্রে যন্ত্রাংশগ্নলি হল ঃ

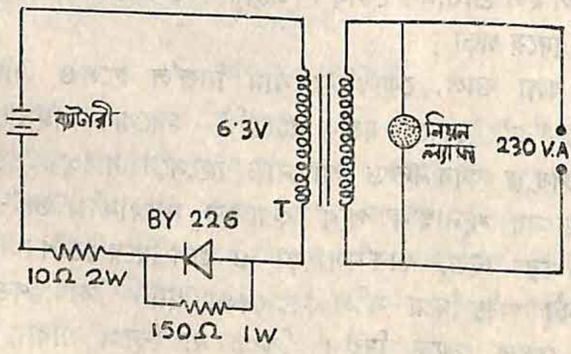
(i) সিলিকন রেটিফায়ার By 12·6,

(ii) ট্রান্সফরমার Tঃ ম্নলমণ্ডলী 23VA.C গৌণকুণ্ডলী 6·3 VA.C.

(iii) রেজিস্টর (ক) 10 ওহম, 2 ওয়াট।

(খ) 150 ওহম, 1 ওয়াট।

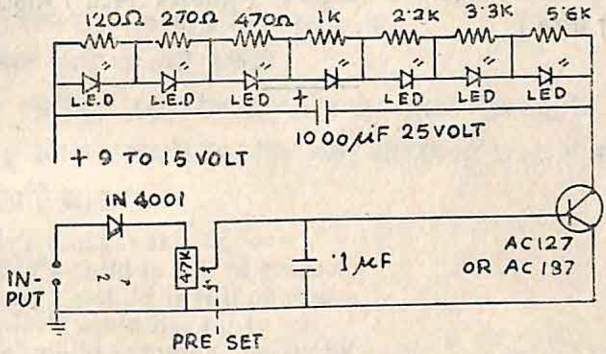
(iv) একটি নিওন ল্যাম্প, ব্যাটারি বাক্স অফ্ / অন্ স্নইচ, তার ইত্যাদি।



চিত্র—9.6

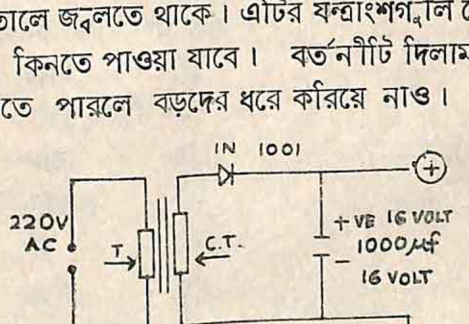
এবার বর্তনী (চিত্র-9.6) দেখে ঝাল দেওয়ার যন্ত্র ব্যবহার করে যন্ত্রটি তৈরি করে নাও। (প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য বা রেডিও দোকানীর সাহায্য নাও)।

যতগুলি পরীক্ষার কথা বললাম, প্রতিক্ষেত্রে সবাইয়ের নজর কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রতি পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করা দরকার। একারণেও আপাতত একটি পরীক্ষা



চিত্র—9.7

ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। এখানে করছি তার কারণ এটি তড়িৎ বর্তনী কিনা। মডেলটির নাম দেওয়া যায় নাচুনে আলো। বর্তমানে অনেক স্টিরিও অ্যামপ্লিফায়ারে এগুলি দেখা যায়। এগুলি গান বা বাজনার তালে তালে জ্বলতে থাকে। এটির যন্ত্রাংশগুলি যে কোন রেডিও টিভির দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। বর্তনীটি দিলাম (চিত্র-9.7)। এবার না বুঝতে পারলে বড়দের ধরে করিয়ে নাও। কারণ এটি ত



চিত্র—98

তোমার পরীক্ষা নয় পরীক্ষাটিকে চিত্তাকর্ষক করার উপকরণ মাত্র। এখানে ব্যবহৃত LEDগুলি বিভিন্ন রঙের হতে পারে, তবে এগুলি একই রকম সাইজের হওয়া চাই। ট্রানজিস্টারে (Ac 127 or Ac 128) “হটসিংক” ব্যবহার করতে হবে। বর্তনীটি তৈরি করে এর

ইনপ্‌ট যে কোন রেডিও বা অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে প্রি-সেট-টির দ্বারা LEDগুলিকে ঠিক করে নিতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাই-এর জন্য দ্বিতীয় বর্তনীটি (চিত্র-9.8) ব্যবহার করা যায়। যদি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে 9 ভোল্টের (ব্যাটারি দিয়ে) নাচুনে আলো তৈরি করা যাবে।

———

10. শুভদিন জন্মদিন

সব সময় কি যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে? এছাড়া কি পরীক্ষা করা যায় না?

যায়, যেমন তোমার শুভ জন্মদিনটা কি?

ধরা যাক দশই আগস্ট, 1968

আমি পরীক্ষা করে বলতে পারি ঐ দিনটা কি বার ছিল। এর জন্য কিন্তু কাগজ কলম ছাড়া অন্য কিছু লাগবে না। আর জন্মবারের সেই কবিতাটি জান ঃ

Mondy's child is fair of face
Tuesday's child is full of grace
Wednesdy's child is full of woe
Thursday's child has far to go
Friday's child is loving and giving
Saturday's child woks hard for his living
And the child that is born on the sabbathday
Is bonny and blithe and good and gay

এবার তোমার জন্মবারের জন্যে প্রথমে লেখ বছরটা অর্থাৎ 1968। এটি 4 দিয়ে ভাগ করলে কেটে যাবে, অর্থাৎ একটি লিপ-ইয়ার। দ্বিতীয়ত মাসগুলোর দিনগুলো লেখ ঃ

জানুয়ারী—31
ফেব্রুয়ারী—29
মার্চ —31
এপ্রিল —30
মে —31
জুন —30
জুলাই —31
আগস্ট —10
সেপ্টেম্বর—
অক্টোবর —
নভেম্বর —
ডিসেম্বর—

মোট—223

তৃতীয়ত বছরটা থেকে 1 বাদ দিয়ে চার দিয়ে ভাগ কর। ভাগশেষ ধরার দরকার নেই। অর্থাৎ,

$$1968-1=1967$$

$$\frac{1967}{4}=491$$, ভাগশেষ ধরার দরকার নেই।

চতুর্থত যোগ কর, ভাগ ফল	491
বছরটি	1968
সব মাসের দিনগ্‌লি	223
	2682
বাদ দাও	−15
	2667

পঞ্চমত 7 দিয়ে ভাগ কর, যদি দেখ ভাগশেষ

= 0 তাহলে জন্মদিনটি শনিবার
= 1 ,, ,, রবিবার
= 2 ,, ,, সোমবার
= 3 ,, ,, মঙ্গলবার
= 4 ,, ,, বুধবার
= 5 ,, ,, বৃস্পতিবার
= 6 ,, ,, শুক্রবার

এখন তোমার জন্মদিনটির ক্ষেত্রে দাঁড়াল $2667 \div 7$; এক্ষেত্রে ভাগশেষ শূন্য। অর্থাৎ 10 আগস্ট 1968 তোমার শুভ জন্মদিনটি ছিল শনিবার। পরীক্ষাটি কি সঠিক সিদ্ধান্ত দিল ?

আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা উদাহরণের পর্যায়ে না রেখে সমীকরণের পর্যায়ে আনা যাক। এটি তুমি যে কোন মহাপুরুষের জন্মদিন কিংবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটার দিন কোন্‌ বারে ঘটেছিল তা জানার কাজে লাগাও।

ধরা যাক Y=বছর বা সাল ; D=জন্মদিন পর্যন্ত মাসগুলির মোট দিনসংখ্যা।

ভাগশেষ না ধরে $\frac{Y-I}{4}=$? নির্ণয় কর।

নির্ণয় কর $S=\left(Y+D+\frac{Y-I}{4}\right)-15$

এবার S-কে 7 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষের সংখ্যাটি নির্ধারণ কর। যদি ভাগশেষ=0 হয় তাহলে শনিবার ; =1 হলে রবিবার ; =2 হলে সোমবার ; =3 হলে মঙ্গলবার ; =4 হলে বুধবার ; =5 হলে বৃহস্পতিবার ; =6 হলে শুক্রবার।

প্রঃ—তোমার জন্মদিন কিবার ছিল তা পরীক্ষা করে বলে দিলাম। এবার আমার জন্মদিনটা কিবার ছিল বলত ? আমার জন্ম তারিখ হল—অক্টোবর 5, 1947।

[উঃ—পরীক্ষায় ভাগশেষ 1 অর্থাৎ রবিবার। বাঃ, ঠিক বলেছ। ধন্যবাদ।]

প্রঃ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল 3 সেপ্টেম্বর, 1939 ; সে দিনটা কি বার ?

[উঃ—অঙ্কের পরীক্ষার ফল রবিবার।]

এবার এ ধরনের অনেক প্রশ্ন নিজেই করে বা বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে উত্তরগুলো করে দাও।

এবার সাধারণ জ্ঞানের একটা পরীক্ষার কথা বলি। ব্যাপারটা হল একটা বেশ সরু ফাটল কিংবা স্কুটারের স্পার্কপ্লাগের মুখের কাছাকাছি ফাঁকটুকুর দূরত্ব কত তা বলতে হবে। অথচ বাড়ীতে মাপার যন্ত্রপাতি বা পরীক্ষাগার ত নেই, তাহলে কি মাপা যাবে না ?

নিশ্চয়ই যাবে। বাবা, দাদা, কাকার দাড়ি কামানোর ব্লেড ত দেখেছ। এরকম কুড়িটা ব্লেড একসঙ্গে করলে এক মিলিমিটার মোটা বা বেধ দাঁড়ায়। তাহলে একটা ব্লেডের বেধ 0·05 মিলিমিটার। এবার বুঝতে পারছ, তুমি কয়েকটা ব্লেড পেলেই কোন সরু ফাটল বা ফাঁকের মাপটুকু সহজেই পেতে পারবে।

প্রঃ—একটা মাথার চুলের ব্যাস কত কিভাবে মাপবে ?

[উঃ—একটা চুল নাও। সরু একটা চোঙের উপর লাগাতার পাক দিয়ে যাও। এবার স্কেল দিয়ে চুল জড়ানো দৈর্ঘ্যটা মাপ। এই দৈর্ঘ্যকে পাকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই চুলের ব্যাস পেয়ে যাবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়াই কেমন করে এ ধরনের সূক্ষ্ম পরিমাপ পরোক্ষে করা যায় দেখলে ত !]

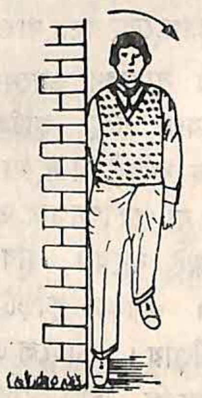
11. চেষ্টা করো, পারবে না

বিজ্ঞান অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) সূত্র মেনেই প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সূত্রগুলি হল সব অসম্ভবের সূত্র। যেমন, তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হল—শক্তি সৃষ্টি করা অসম্ভব। দ্বিতীয় সূত্র হল—এমন একটা যন্ত্র তৈরি করা অসম্ভব যা প্রযুক্ত পুরো তাপকে কাজে রূপান্তরিত করতে পারবে। তৃতীয় সূত্র হল—পরমশূন্য উষ্ণতায় পৌঁছানো অসম্ভব। যাই হোক্ এভাবে অসম্ভবের সূত্র দিয়েই অনেক কিছু সম্ভব করা গেছে। এবার দু-একটি অসম্ভব-পরীক্ষার কথা বলি।

তুমি তোমার নিজের চুল নিজে টেনে নিজেকে উপরের দিকে তুলতে পারবে না। 11.1নং ছবির মত যেভাবে ছেলেটা বসে আছে, ঠিক তেমনি করে চেয়ারে বসে পড়ো। শিরদাঁড়া খাড়া রেখে বসো ; আর চেয়ারের নিচে পা ঢুকিও না। এবার তোমার পা না নাড়িয়ে বা সামনে না ঝুঁকে ওঠার চেষ্টা করো। যতই চেষ্টা করো—পারবে না।



চিত্র—11.1

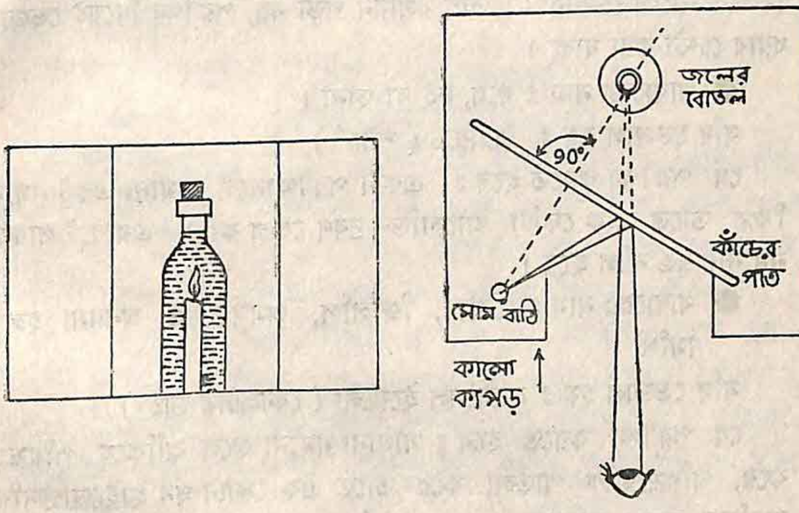


চিত্র—11.2

পড়া না পারলে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকো—এরকম শাস্তির প্রচলন আগেকার দিনে স্কুলে ছিল। কিন্তু যদি বলা যায়, তোমার ডান পা ও ডান কাঁধ একসঙ্গে দেওয়ালে ঠেকিয়ে বাঁ-পাটা তোল ত দেখি ? (চিত্র 11.2)—কি, পারলে ? কিছুতেই পারবে না। ভরকেন্দ্র ও স্থিরসাম্যে আসার শর্তাবলি হল এসব না পারার পিছনে যুক্তি।

12. জলের মধ্যে প্রজ্বলিত মোমবাতি

সাধারণভাবে জলে ডুবে থাকা অবস্থায় একটা মোমবাতি জ্বলতে পারে না কিন্তু আলোর প্রতিসরণ ও প্রতিফলন ধর্ম কাজে লাগিয়ে দৃষ্টিভ্রমের কারণে দেখানো যায় জলের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই মোমবাতি নির্বিবাদে জ্বলছে। পরীক্ষাটা করে দেখলেই ম্যাজিকের মত মজা



চিত্র—12.1

পাওয়া যাবে। সমগ্র ব্যাপারটি কিভাবে সাজাতে হবে তা ছবিতে দেখানো হল। চারদিক কালো কাপড় দিয়ে ঘিরে একটা ঘরের মত কর। দেখার জন্য সামনে দরকার মত একটা ফাঁক রাখো।

এবার ছবি বাঁধানোর একটা বড় সাইজের স্বচ্ছকাচ, জ্বলন্ত মোমবাতি এবং জলভর্তি বোতল ছবিতে দেখানো অবস্থানে বসাও। এরপর কিছু দূর থেকে ঐ দরজার মত ফাঁক দিয়ে সোজা দেখলে, বোতলের জলের মধ্যেই মোমবাতিকে জ্বলতে দেখবে (চিত্র 12.1)।

মোমবাতির জায়গায় সাদা কাপড় পরা এবং গোটা মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা কোন লোককে বসিয়ে তার উপর জোরালো আলো ফেললে, দর্শক বোতলের জায়গায় মুণ্ডুহীন ভূত বা কবন্ধ দেখতে পাবে। প্রতিফলন প্রতিসরণের পড়া নয়, পরীক্ষাটাই সবার বাহবা কুড়োবে।

———

13. ভেজাল ! ভেজাল

রসায়ন শাস্ত্রের পড়া নাকি বেশীর ভাগ মনে রাখতে হয়, বোঝার কিছু নেই। তবে বর্তমান সভ্যতার জীবন যন্ত্রণার অন্য নাম হিসেবে বলা যায় ভেজাল যন্ত্রণা। সুকান্তের কবিতাটি—'ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই ভেজাল সারা দেশটায়, ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়'। তাই রসায়ন পড়া নয়, পরীক্ষা দিয়েই ভেজাল ধরার চেষ্টা করা যাক্।

● খাবারের নাম ঃ দুধ, দই বা ছানা।

যদি ভেজাল হয় ঃ এরারুট (স্টার্চ)

যে পরীক্ষা করতে হবে ঃ একটা পরীক্ষানলে সামান্য একটু নমুনা নিয়ে তাতে এক ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ যোগ কর। এরারুট থাকলে নমুনার রঙ নীল হবে।

● খাবারের নাম ঃ বোঁদে, জিলিপি, অমৃতি ও অন্যান্য হলদে মিষ্টি।

যদি ভেজাল হয় ঃ মেটানিল ইয়েলো (কোলটার ডাই)

যে পরীক্ষা করতে হবে ঃ সামান্য নমুনা জলে ঝাঁকিয়ে পরিস্রুত করে, পরিস্রুতকে পাতলা করে তাতে এক ফোঁটা ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে। মেটানিল ইয়েলো থাকলে দ্রবণের রঙ লাল হবে।

● খাবারের নাম ঃ লাল গোটা লংকা।

যদি ভেজাল হয় ঃ লাল রঙ দিয়ে পালিশ।

যে পরীক্ষা করতে হবে ঃ তরল প্যারাফিনে সামান্য তুলো ভিজিয়ে লাল গোটা লংকার বাইরের দিকে ঘষতে হবে। তুলো যদি লাল হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে খাদ্যে লাল রঙ মাখানো হয়েছে।

● খাবারের নাম ঃ হলুদ (গোটা বা গুঁড়ো)।

যদি ভেজাল হয় ঃ মেটানিল ইয়েলো

যে পরীক্ষা করতে হবে ঃ কিছু জল দিয়ে নমুনা ঝাঁকিয়ে নিয়ে জল দিয়ে পাতলা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রবণ বর্ণহীন হয়। তারপর এতে কয়েক ফোঁটা ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে। দ্রবণের রং লাল হলে বুঝতে হবে খাদ্যে মেটানিল ইয়েলো মেশানো হয়েছে।

● খাবারের নাম ঃ ঘি। যদি ভেজাল হয় ঃ বনস্পতি মিশ্রিত।

যে পরীক্ষা করতে হবে ঃ 10 মিলিলিটার ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে সামান্য কয়েক দানা চিনি দ্রবীভূত করে কাঁচের ছিপিযুক্ত পরীক্ষানলে নিতে হবে। এর মধ্যে 10 মিলিলিটার গলানো ঘি যোগ করে পরীক্ষানলের ছিপি লাগিয়ে 2 মিনিট জোরে ঝাঁকাতে হবে। অ্যাসিড স্তরের রং লাল বা লালাভ হলে বুঝতে হবে ঘি-তে বনস্পতি মেশানো রয়েছে।

● খাবারের নাম ঃ সরিষা বা উদ্ভিজ্জ তেল।

যদি ভেজাল হয় ঃ শিয়াল কাঁটার তেল মেশানো।

যে পরীক্ষা করতে হবে ঃ 4 মিলিলিটার পরিস্রুত তেল 2 মিলিলিটার ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে একটা পরীক্ষানলে ভাল করে ঝাঁকাতে হবে। তারপর 5 মিনিট মিশ্রণটিকে গরম জলের বাথে গরম করতে হবে। উপর থেকে তেল ঢেলে নিয়ে নিচের অ্যাসিড স্তরে 1 মিলি লিটার 10% ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ আসতে আসতে ঢালতে হবে। তারপর পরীক্ষা নলটাকে দুহাতের তালুর মধ্যে ঘোরাতে হবে এবং ফুটন্ত জলের বাথে মিশ্রণটিকে 10 মিনিট গরম করতে হবে। শেয়াল-কাঁটার তেল মেশানো থাকলে লালচে বাদামী রঙের অধঃক্ষেপ বা দানা দেখা যাবে।

পরীক্ষা করে নিশ্চয়ই দেখবে। তোমার স্কুলের বা কলেজের পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে প্রথম প্রথম করে দেখতে পার। যদি ভেজাল নির্ধারণ করতে পার, তাহলে দেখবে পড়ার জিনিসকে যে জীবনের কাজে লাগাতে পারলে তা ভেবেই একটা বিশেষ শিহরণ অনুভব করবে। মনে রেখো খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয়, তবে এই পরীক্ষা-গুলিতে তা ধরা পড়বেই। যদি ভেজাল ধরা না পড়ে তাহলে কিন্তু ভেজাল একদম নেই তা বলা যাবে না! স্বল্প পরিমাণ ভেজাল একদম নেই তা বলা যাবে না। স্বল্প পরিমাণ ভেজাল ধরার বিশেষ সূক্ষ্ম পরীক্ষা হল—'থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি (TLC)', 'গ্যাস লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি (GLC)' ; স্পেকট্রোস্কোপি পদ্ধতি ইত্যাদি। কি সব গালভরা নাম তাই না? বিজ্ঞান পরিবেশের মধ্যে একটু বড় হলে এগুলোকে দূরের প্রদেশের অজানা ভাষা হিসেবে মোটেই মনে হবে না।

---

14. রসায়নের কারসাজি

আগে যেটা সমাজের মুরুব্বিদের হাতে ছিল, তাদের অনেকগুলি বর্তমানে সাধুবাবার কারসাজি হিসাবে কিংবা জীবিকার প্রয়োজনে কাজে লাগানোর কারণে রাস্তার চৌমাথায় কিংবা কোর্টকাচারির প্রাঙ্গণে দেখা যায়। সাধারণ দর্শক এ সবের কার্যকারণ জানে না—তাই আপাতভাবে "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না" এরকম একটা চলনসই যুক্তি খাড়া করে পকেট থেকে কয়েকটা পয়সা খসিয়ে বাড়ী ফেরে। চায়ের দোকানে বা গ্রামের কোন গাছতলায় খোসমেজাজে ছেলে বুড়ো সবার সামনে রঙের মোড়কে নিজের চোখে দেখা অস্বাভাবিক ঘটনার কথা বলে। সবাই এসব মন দিয়ে শোনে, সমাজের মোটামুটি গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেই তার কথা বিশ্বাস করে, হয়ত বা সারাজীবন তার লালন-পালন করে চলে। এভাবেই বিশ্বাস বা ধারণা অন্ধত্ব লাভ করে। আজকের দিনে আমাদের পাঠক্রমের মধ্যেই অনেক সব জিনিস আছে যা এসব অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিতে সাহায্য করে। এরকম কিছু রসায়ন বিদ্যার পাঠ থেকে নিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

[1]

'বলের নাচন দেখে যা'

একটা হর্‌লিকস জাতীয় বোতল নিয়ে তাতে দুচামচ সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ঢাল। এরপর প্রায় মুখ পর্যন্ত জল ভর্তি করে তিন চারটে ন্যাপ্‌থিলিন বল ফেলে দাও (চিত্র 14.1)। আকর্ষণীয় করার জন্য জলটাকে একটু রঙ দিয়ে রঙীন কর। এবার জলে দু চামচ সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেই ন্যাপ্‌থিলিন বলের নাচন শুরু হবে। দেখা যাবে বলগুলি দ্রুত উপরে উঠছে, পরক্ষণেই নামছে। এ রকম দৃশ্য সবার কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু কেন উঠছে বা নামছে? কারণটা রসায়নবিদ্যার বিষয়।



চিত্র—14.1

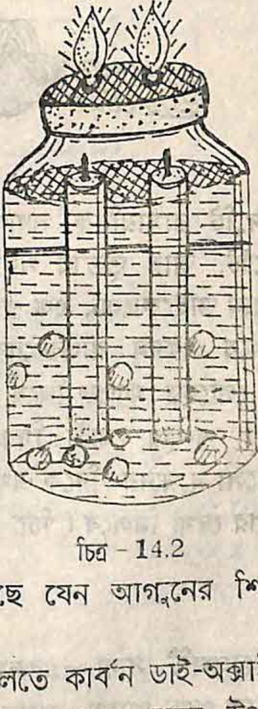
সাইট্রিক অ্যাসিড সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের মিলিত বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি হয় এবং বুদ্‌বুদ্‌গুলি ন্যাপ্‌থিলিন বলের গায়ে জমা হয়। এর ফলে আর্কিমিডিসকে শ্রদ্ধা জানাতে (সূত্র মেনে) বলগুলি উপরে ওঠে, জলতলের কাছে বুদ্‌বুদ্‌ ন্যাপথিলিন্‌ গা ছেড়ে বায়ুমণ্ডলে হারিয়ে যায়, আর বেচারা ন্যাপথিলিন বল নিজের ভারে আবার তলায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এই হল এই বল নাচার কারণ।

[2]

'ভৌতিক শিখা'

যদি দেখ একটা জারে দু তিনটে মোমবাতি মুখ উঁচিয়ে আছে ; কিন্তু তার বাতি স্বাভাবিক লাগাতার ভাবে জ্বলছে না—বেশ কিছুটা উঁচুতে শিখা আকারে জ্বলছে। এ যেন ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা ভাবে বেশ কিছুটা উঁচুতে, অথচ কথা বলছে। চোখ বড় বড় করে দেখার মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষটা হবে যদি এটিকে অতিপ্রাকৃত কিছু বলে ভাবা হয়। এবার পরীক্ষাটা করা যাক্‌।

কাচের বোতলে দু চামচ সাইট্রিক অ্যাসিড নিয়ে আধ বোতল পর্যন্ত জল ভর্তি কর। এবার একটা পাতলা কাগজে দেড় বা দুচামচ সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট ভরা কাগজের রোলটি বোতলে ফেলে বোতলের মুখে ঢাকনা দাও। এতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বুদবুদ জল তোলপাড় করে বেরুবে। এবার একটা জ্বলন্ত মোমবাতিতে তার লাগিয়ে বোতলের ঢাকনা সরিয়ে ধীরে ধীরে ডোবাও। কিছুদূর ঢোকালেই দেখা যাবে মোমবাতির শিখা মোমবাতির মুখ ছেড়ে উঁচুতে জ্বলছে যেন আগুনের শিখা ভাসছে (চিত্র-14.2)।



চিত্র - 14.2

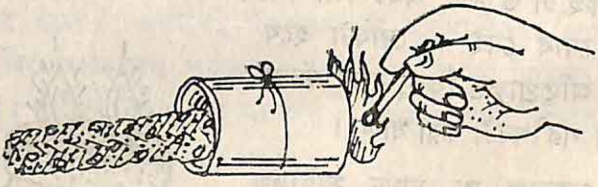
মোম থেকে যে গ্যাস বেরুচ্ছে তাকে জ্বলতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সাহায্য করে না। তাই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের স্তরের উপরে

আগুনের বা মোম শিখাকে ভাসতে কিংবা জ্বলতে দেখা যায়। দু-তিনটে মোমবাতি এক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটি করলে—খেলাটি দৃষ্টি-নন্দন হয় বা সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

[3]

দেওয়ালী সাপ

কালী পুজোর বাজারে বাজীর দোকানে 'সাপবাজী' বলে যা বিক্রী হয়, তা হল এক একটা ছোট বড়ি। এতে আগুন লাগালে প্রচণ্ড ধোঁয়া বেরোয় আর ধীরে ধীরে লম্বা একটা সাপের গড়নের কালো ছাই মেঝে বা মাটিতে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ধোঁয়াটা কিন্তু বিষাক্ত, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এখানে এমন একটা সাপবাজীর কথা বলছি যা মোটেই ক্ষতিকর নয়। চেষ্টা করে দেখতে দোষের কি ?



চিত্র—14.3

দুটি রাসায়নিক পদার্থ পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট এবং পটাসিয়াম নাইট্রেট, আর তৃতীয় পদার্থ হিসাবে চিনি একটু জোগাড় করতে হবে। দু গ্রাম ডাইক্রোমেট, এক গ্রাম পটাশিয়াম নাইট্রেট ও এক গ্রাম চিনি নিয়ে মিশিয়ে একদম পাউডারের মত গুঁড়ো করে নিতে হবে। এবার একটা শক্ত গোছের কাগজ নিয়ে শঙ্কুর মত মুড়ে তার মধ্যে মিশ্রণটি ঢোকাতে হবে। শঙ্কুর মোটা দিকটা ভাল করে কাগজ দিয়ে আঁটিয়ে দিয়ে সুচালো মুখটার দিকে এখন আগুন ধরালেই প্রত্যাশিত নির্বিষ খেলনা সাপের দেখা মিলবে (চিত্র-14.3)।

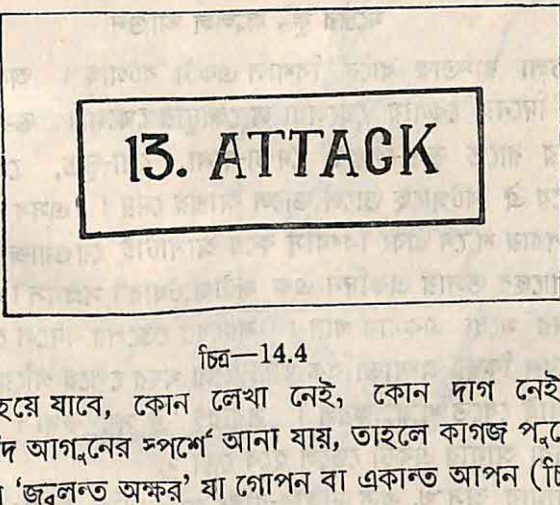
[4]

গোপন বার্তা

কাগজটি সাদা—একদম সাদা—কোন কলঙ্ক নেই। নিরীহভাবেই টেবিলে পড়ে আছে—সন্দেহের কোন ব্যাপরই নেই। কথাবার্তার ফাঁকে

কোন এক আগন্তুক সাদা কাগজটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখেই সৌজন্যমূলক কয়েকটা কথাবার্তা সেরে হয়ত মিলিটারী ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। পরের দিন জানা গেল শত্রুপক্ষের অনেক গোপন বার্তাই ক্যাপ্টেন জেনে গেছেন। এটা কি করে হল ? —ঐ সাদা কাগজটাই কারণ।—সাদা কাগজের গর্ভেই ছিল অদৃশ্য অক্ষর যাকে আগুনের স্পর্শে সতেজ, সজীব ও দৃশ্যমান করে তুলতে হয়েছে। —এটাও রসায়নের একটা কারসাজ। অদৃশ্য অক্ষর সৃষ্টির পদ্ধতি অনেক রয়েছে। এখন একটির কথা বলা যাক্।

আধচামচ সোডিয়াম বাইকার্বোনেট নিয়ে জলে গুলে ফেল। এবার একটা তুলি নিয়ে ঐ দ্রবণে ডুবিয়ে সাদা কাগজে যা লেখার না থেমে একটানাভাবে লিখে যাও। শুকোতে দাও। কাগজ



চিত্র—14.4

স্বাভাবিক হয়ে যাবে, কোন লেখা নেই, কোন দাগ নেই। এবার কাগজটি যদি আগুনের স্পর্শে আনা যায়, তাহলে কাগজ পুড়ে যাবে—দেখিয়ে যাবে 'জ্বলন্ত অক্ষর' যা গোপন বা একান্ত আপন (চিত্র-14.4)।

গোপনবার্তার ক্ষেত্রে একটা ফুটনোট যোগ করা যাক্।*

* [ভিনিগার, কোবাল্ট ক্লোরাইড কিংবা ফেরিক ক্লোরাইড বা ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটের বর্ণহীন দ্রবণ দিয়ে লিখে আগুনের উপর ধরলে লেখা ফুটে উঠবে। প্রথম এবং শেষটির ক্ষেত্রে আবার পড়ার পর মিলিয়ে যাবে।

এছাড়া পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইড, কপার সালফেট, ফেনপ্থিলিনের হালকা দ্রবণের দ্বারা কাগজের উপর লিখে যথাক্রমে আয়রন সালফেট,

তরল অ্যামোনিয়া বা সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ দিয়ে ধ্‌লে লেখা ফ্‌টে উঠবে। রাসায়নিক পদার্থগ্‌লি সহজে স্কুল কলেজের পরীক্ষাগারেই পাওয়া যায়।

উল্টো ব্যাপারও করা যায়। অর্থাৎ সাদা কাগজে কালি দিয়ে লেখা রয়েছে। কেবল একবার তার ওপর হাত ব্‌লিয়ে লেখাটিকে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। এখানে ভাতের মাড়ের বা ফ্যানের সঙ্গে টিংচার অফ আইয়োডিন মিশিয়ে একটা বাদামী রং-এ আঠালো পেস্ট তৈরি কর। এবার ওতে কলম ড্‌বিয়ে কাগজে লেখ। কাগজটি স্‌কিয়ে গেলে তার উপর হাত ঘষে দাও। লেখাটি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে যেন কাগজটির উপর কোন লেখা কোনদিনই ছিল না।]

[5]

মন্ত্রের ফুঁ, জ্বলল আগুন

বাসচলা রাস্তার ধারে বিশাল একটা বটগাছ। অনেকগ্‌লো তার ঝ্‌রি। দিনের বেলায় ছেলেরা ল্‌কোচুরি খেলে। ভরদ্‌প্‌রে কিংবা অমাবস্যার রাতে ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানা, গো-ভূত, ঘোড়া-ভূত সব জাগ্রত হয়ে ঐ বটগাছে ডালে ডালে আশ্রয় নেয়। এসব কেউ দেখেনি। বংশপরম্পরায় শ্‌নে এবং বিশ্বাস করে আসাটাই রেওয়াজ। যাই হোক্ এই বটগাছের তলায় একদিন এক জটাজ্‌টধারী সন্ন্যাসী এসে হাজির। সে দিনের মধ্যে একবার খায়। সরষের তেলের বদলে কেরোসিন তেল খায়। বেশ কিছ্‌ অস্বাভাবিক আচরণের খবর পেয়ে গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে-ব্‌ড়ো সবাই যেতে শ্‌র্‌ করল। সবারই 'ঐ সব' কথা ঃ

…বাবা আমার একটা ছেলে হবে তো ?

…আমার অস্‌খ, কত ডাক্তার-বদ্দি দেখিয়েছি, কিছ্‌ হয়নি, আপনি না দেখলে মরে যাব।

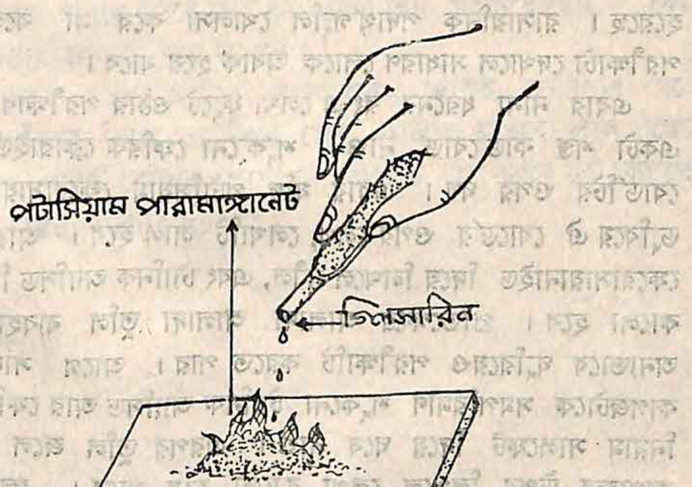
বাড়ীর ছেলেটার পড়াগ্‌নার জন্য আশীর্বাদ, মেয়েটার বিয়ে, এছাড়া পেটের অস্‌খ, স্বামীর ভালবাসা, জমি-জায়গার মামলা, গর্‌র দ্‌ধ বন্ধ কাটানো, গাছে ফ্‌ল হচ্ছে, ফল হচ্ছে না—কেউ 'বান' মেরে দিয়েছে ইত্যাদি বিষয়েও সাধ্‌বাবা অপরিহার্য। সাধ্‌বাবার এখন রমরমা বাজার। এবার পাশাপাশি গ্রামের সবাই মিলে সাধ্‌বাবার জন্য একটা মন্দির গড়া হবে বলে চাঁদা তুলছে। ভূত-পেত্নী, দৈত্যিদানার

জায়গায় সাধুবাবা প্রতিস্থাপিত হচ্ছেন। এসবের পিছনে বিশেষ করে সাধুবাবার একটি অলৌকিক ক্ষমতা সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। আর সেটি হল—কিছুক্ষণ হ্রিং' ট্রিং, ট্রিং, ছট্...ওঁ স্বাহা। ইত্যাদি গুরুগম্ভীর দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের পর ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানো। সে আগুনের তাপে মনোস্কামনা পূর্ণ হয়, রোগ দূর হয়।

কিন্তু সত্যি কি অলৌকিক! সত্যি কি অতিপ্রাকৃত!

নিজেরাই রসায়নের জ্ঞানটুকু সম্বল করে সাধুবাবার মত করতে পারি কিনা দেখা যাক্।

করাত কলের কাঠের গুঁড়ো কিছুটা নিয়ে তার উপর মিহি পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের আধ চামচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া যাক্। এবার



চিত্র—14.5

যেন ঘি দেওয়া হচ্ছে এরকম ভাবে 'কোসাকুসি' ব্যবহার করে, তরল গ্লিসারিনকে মন্ত্র পড়তে পড়তে পারমাঙ্গানেটের উপর একটু একটু করে 'ওঁ স্বাহাঃ' বলে ঢালা যাক্। স্বল্পসময়ের মধ্যেই কাঠের গুঁড়োর স্তূপ থেকে ধুঁয়া এবং আগুনের শিখা বেরুবে (চিত্র-14.5)।

সরল সাসাসিধে মানুষ ভিতরের খবরটুকু না জানলে এদেখেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

[6]

রং-এর বাহার

একটা পাত্রে 500 মিলিলিটার জল নিয়ে তার মধ্যে 5 গ্রাম ফেরিক-অ্যামোনিয়াম সালফেট গুলে নাও। এবার টেবিলের উপর রাখা পাঁচটি পাত্রে যথাক্রমে (i) পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ; (ii) বেরিয়াম ক্লোরাইড ; (iii) পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ; (iv) ট্যানিক অ্যাসিড ; (v) টারটারিক অ্যাসিড রাখ। এবার ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ পর পর পাঁচটি পাত্রে ঢেলে যাও। দ্রবণ ঢালার সাথে সাথে দেখবে 1নং পাত্রে লাল, 2নং পাত্রে সাদা, 3নং পাত্রে নীল, 4নং পাত্রে কালো এবং 5নং পাত্রে সবুজ রং এর উদয় হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থগুলি খোলসা করে না বলে, কেবল পরীক্ষাটা দেখালে সাধারণ লোকে অবাক হয়ে যাবে।

এবার নানা ধরনের রং-এ লেখা ফুটে ওঠার পরীক্ষার কথা বলি। একটা শক্ত কার্ডবোর্ড নাও। শুক্‌নো ফেরিক ক্লোরাইড লবণ দিয়ে বোর্ডটির ওপর ঘষ। এবার যদি পটাসিয়াম ফেরোসায়ানেটে তুলি ডুবিয়ে ঐ বোর্ডের ওপর লেখ, লেখাটি লাল হবে। আর পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড দিয়ে লিখলে নীল, এবং ট্যানিক অ্যাসিড দিয়ে লিখলে কালো হবে। প্রতিক্ষেত্রে আলাদা আলাদা তুলি ব্যবহার করবে। অন্যভাবে ঘুরিয়েও পরীক্ষাটি করতে পার। আগে সাদা খসখসে কাগজটাকে সমপরিমাণ শুকনো ট্যানিক অ্যাসিড আর ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে ঘষে নাও। এরপর তুলি জলে ডুবিয়ে ঐ কাগজের উপর লিখলে লেখা কালো হয়ে যাবে। লেখা টক্‌টকে লালও করা যায়। এজন্য আগে ঐ সাদা কাগজের ওপর সমপরিমাণ সোডিয়াম সেলিসাইলেট ও ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে ঘষে নিতে হবে। এরপর জলে তুলি ডুবিয়ে লেখা শুরু কর। দেখবে একদম টক্‌টকে লাল।

[7]

রাসায়নিক আগ্নেয়গিরি

অ্যাসবেস্টস বোর্ডের ওপর বা কোন ধাতব পাতের ওপর কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট মন্দিরের আকারে রাখ। একটি

পাকানো ফিল্টার পেপারের প্রায় দু'সেণ্টিমিটার অ্যালকোহলে ভিজিয়ে নাও। এবার এই ভেজা ফিল্টার পেপারের টুক্‌রোটি মন্দিরের চূড়ায় বসিয়ে দাও এবং আগুন লাগাও। দেখ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সবুজ রঙের ছাই পাশে জমা হবে।

প্রঃ—ফিল্টার পেপারের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি সব সময় একই রকম হয় না। কোনটা অপেক্ষাকৃত বড়, কোনটা বা অনেক বেশী সূক্ষ্ম। দু তিন ধরনের ফিল্টার পেপার থাকলে—তাদের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে বেশী সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ?

[উঃ—ফিল্টার কাগজগুলির প্রত্যেকটির একফালি করে কেটে নিয়ে তাদের প্রান্তগুলি জলে ছোঁয়াও। যে কাগজে জল শোষিত হয়ে সবচেয়ে উপরে উঠবে সেই কাগজটির ছিদ্র সবচেয়ে ছোট। কেন ঘটে ? পড়ার ব্যাপার, পরে জানবে।]

নিজে কর ঃ কোন ছুরির ফলার আগে থেকেই জবাফুল ঘষে লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তা দিয়ে লেবু কাটলে দেখবে লাল রক্তের মতো তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। লোকে মনে করবে রক্ত বেরুচ্ছে অতিপ্রাকৃত কিছু ব্যাপার স্যাপার।

———